পুথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ)

পুথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ)

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

পুথি সাহিত্যে মহানবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

তাওহীদ প্রকাশনী

মীরপুর, ঢাকা-১২১৬

পুথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ)

মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

প্রকাশক ঃ তাওহীদ প্রকাশনীর পক্ষে
ফয়সল আবদুল্লাহ আনাস
'সাহিত্যাঙ্গন'
৪২ সেনপাড়া পর্বতা, ঢাকা-১২১৬।

পরিবেশক ঃ মদীনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রথম প্রকাশ ঃ শাওয়াল ১৪১২ হিজরী
এপ্রিল, ১৯৯২ ঈসায়ী
বৈশাখ, ১৩৯৯ বাংলা

মুদ্রণে ঃ মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বিনিময় ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

PUTHISAHITYE MAHANABI (SA)

M. A. Quasem Bhuiya

Publisher : Tauhid Prakashani
Senpara Parbata, Dhaka-1216

First Edition : April, 1992 C. E
Shawal, 1412 H
Bhaishakh, 1399 B S

Printer : MADINA PRINTERS
38/2, Banglabazar, Dhaka-1100.

Distributor : MADINA PUBLICATIONS
38/2, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 30 and U. S. Dollar two only.

উৎসর্গ

রাহমানিয়া হাউস, ফেনী

এর

মৌলভী ফজলুর রহমান সাহেব (মৃত্যু ঃ ১৯৮২ ঈঃ)

মরহুম মগফুর

এর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

স্মরণ

দাদা সাহেব

মৌলভী সদর আলী ভূঞা (মৃত্যু ঃ ১৩৩৫ বাং/১৯২৮)

গাফারাল্লাহু লাহু

ইবনে

মৌলভী আম্বর আলী খান

মরহুম মগফুর।

আরজনামা

জানহ যতসব বঙ্গভাষী হিন্দু মুসলমান।
কেমনে পয়দা হইল বাংলায় পুঁথির বয়ান।।
আদিতে মুসলিম বাদশার দিলাসা পাইয়া।
বেশুমার পুঁথিকাব্য উঠিল গড়িয়া।।

মুসলিম শায়েরের বহুত পুঁথিতে।
শেষ নবীর প্রসঙ্গ-কথা পাবেন দেখিতে।।
কতক পুঁথি শুধু পাক সীরাতে ভরপুর।
বিলায়েছে নবীপ্রেমিকের মাঝে অমৃত মধুর।।

উচিত আছিল এ পুঁথি পয়ারে রচিতে।
লেকিন জামানার তাকাজা নারিনু ঠেলিতে।।
হালে শায়েরী চাহেনা লোকে সীরাত বর্ণনায়।
হকিকত বুঝে কেহ না দিবেন গঞ্জনা।।

এতেক আরজ মেরা হইল তামাম।
সবার হুজুরে আমার হাজার ছালাম।।

দেশের প্রখ্যাত নজরুল বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় কবির বাল্য বন্ধু কবি আলহাজ্ব সূফী জুলফিকার হায়দার সাহেবের আশীষ বাণী

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার
দয়া ও করুণা যাঁর অশেষ অপার।

এই পৃথিবীতে সাহিত্য, শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন যারা, তাদের অনেকেরই সৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে আসল জিনিসটি উপলব্ধি করার পথে যথার্থ পথের সন্ধান--সত্যপথের সন্ধান তারা পায় নাই। আমার সম্পর্কে আমি এই টুকুই বলছি আমি শুধুমাত্র এই জানি--আমি কিছুই জানি না। নিত্যই মনে পড়ে পারস্য প্রতিভা কবিদের এক কবির গুটি কয়েক ছত্র।

কেন বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্ব মাঝে ?
কোথা হতে আসছি ভেসে হেথায় বা মোর কিসের কাজ।
কোথা পুন যেতে হবে অজানা সে একটি দিন
উধাও সে কোন মরুর পারে হাওয়ার মতই লক্ষহীন।

এই আকুল আকুতি ভরা জিজ্ঞাসার জবাব যদি কেও পেতে আকাংখা করে তাহলে হজরত সাইয়েদুল মুরসালীন (সাঃ) এর মারফতে পাওয়া কোরান করীম এবং হাদিস শরীফের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা অপরিহার্য। এই বিশ্বে যত কিছু কথা যত কিছু কাজ সবার উপর শিরতাজ নিখিল বিপুল বিরাট সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। কোন এক নবী প্রেমিক বলেছেন ঃ

তৌহিদ ভি রৌশন হ্যায় উস্‌নূরে মুজারাদছে
খালি না ফিরা কুঁই দরবারে মোহাম্মদছে
মুছাছে কুঁই পুঁছে যাতে হু কাহা
শুনলো কোরানকি পর্দামে বাতে হ্যায় মোহাম্মদছে।
জুকুছ মুজে লেনা জুকুছ মুজে কাহ্‌না
আল্লাছে কাহা, কাহা লৌংগা মোহাম্মদছে।
আল্লাতো দেতা হ্যায় মিলতা হ্যায় মোহাম্মদছে
পাক কোরান কালাম খোদা কি হ্যায়
মাগার মিলা হ্যায় মোহাম্মদছে
তৌহিদ ভি রৌশন হ্যায় উস্‌নূরে মুজারাদছে।

এই পৃথিবীতে লিখবার বলবার কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি করবার একটি বিষয় বনি আদমের জন্য রয়েছে যে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ).........। এর উপর লেখক **যে সমস্ত** রচনা জাতিকে দান করেছেন আমি সেসব অনবদ্য সৃষ্টি আগ্রহে পাঠ **করেছি এবং পরম** আনন্দে আপ্লুত হয়েছি। সুমহান পবিত্র সাহিত্য সৃষ্টির **যে পথ** তিনি বেছে নিয়েছেন এই পথের পথিকদের জন্য—রাব্বুল বারী আল্লা-জাল্লাশানুহুর রহমত বরকত ফজল করম অবারিত ধারায় নিত্য বর্ষিত হয়। তিনি সেই দুর্লভ মহাসৌভাগ্য বর্ষণ-ধারায় অভিষিক্ত হোন, এই দোয়া আমার সমস্ত অন্তর নিসৃত, তার জন্য আল্লাহর দরবারে নিবেদন করছি। আল্লাজাল্লা-শানুহু, আমার এই সন্তানতুল্য লেখকের দীর্ঘ জীবন, নিরাপদ জীবন, পুণ্যময় জীবন, মঙ্গলময় জীবন, গৌরবময় জীবন, সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে উল্লসিত জীবন দান করুন—আমীন! এই শুভ কামনা তার জন্য রইল। আমীন !!

খোশবাগ — ***সুফী জুলফিকার হায়দার***

ধানমণ্ডি, ঢাকা — ১৮-৩-৮০

ভূমিকা

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার।
রহমান রহীম যিনি করুণার আধার।।
অযুত সালাত সালাম শেষ নবী পরে।
পবিত্রা ভার্যাগণ আর আল আসহাবগণে।।

হযরত মুর্শীদে কামেল হায়াতে থাকিতে।
আদেশ করেন দ্বীনের কথা অধিক লিখিতে।।
এ আদেশ শিরে ধরে করিলাম ঠিক।
দ্বীনের কথা নবীর কথা কহিমু অধিক।।

হযরত আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (১৯১১-৭৪ ঈঃ) মোজাদ্দেদী বরকতী (রাহঃ) এর উপরোক্ত নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত জীবন বিধানের ভিত্তিতে আমার পূর্ণাংগ সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। তজ্জন্য আল্লাহতা'আলার বেশুমার শুকরিয়া ও হামদ প্রকাশ করছি।

পুঁথি সাহিত্য পুরাতন ও মধ্যযুগের কাব্যিক শিল্পরূপ। কালের প্রকোপে ইহার চূড়ান্ত পরিণাম ও পরিণতি কি হইবে বলা যায় না। আধুনিক মননের দিক হইতে বিচার করিলে আলোচ্য সাহিত্য সৃষ্টির সব কিছু সাহিত্য মূল্যের নিরিখে উত্তীর্ণ হয় না। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, কোন্ যুগে ইহার সূচনা ও বিকাশ। বিশেষ সময়ে বিশেষ ক্ষেত্রে পুঁথি সাহিত্য

পাঠক মনের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। আর বাংলার মানুষ সেই পুঁথি ভুক্ত নবী-চরিতমূলক রচনা হইতেই অনেক ধর্মীয় প্রেরণা ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মহানবীর অনুসারী। সুতরাং এই ভূখণ্ডের অসংখ্য পুঁথিয়াল, কবি সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও লেখক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র জীবনী নিয়া সর্বদা কবিতা, প্রবন্ধ, গজল-নাত ও পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন। আবার ইংরেজী, আরবী, ফারসী ও উর্দু সাহিত্য হইতে অনেক পুস্তক বাংলাভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মহানবীর সূর্যসম ব্যক্তিত্ব প্রতিটি বাংলাভাষী সাহিত্য সেবীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। সকলেই স্ব স্ব দৃষ্টি কোণ হইতে এই বিরাট চরিত্রকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফলতার দাবী করিতে পারেন নাই।

বিগত ১৯৬৯ সাল হইতে বিভিন্ন পাঠাগার ও লাইব্রেরীর সীরাত গ্রন্থ হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমি সর্বশেষ নবীর মহান জীবনকে নিম্নোক্ত সাহিত্য পর্যায়ে বিভক্ত করতঃ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশে প্রয়াসী আছি।

(ক) পুঁথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ) (খ) বাংলা কাব্যে সর্বশেষ নবী (সাঃ) (গ) বাংলা গদ্যে শেষ নবী (সাঃ) (ঘ) অনূদিত সাহিত্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) (ঙ) পরধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ) (চ) মৌলুদ সাহিত্যে রহমাতাল্লিল আলামীন (সাঃ) (ছ) শিশু সাহিত্যে মানুষ নবী (সাঃ)।

প্রবন্ধগুলির ভিত্তিকে গ্রন্থ প্রকাশনার-পরিকল্পনার প্রথম প্রয়াস হইল ১৯৯১ সালে প্রকাশিত 'পরধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ)' নামক পুস্তকটি। গ্রন্থটি সুধী সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হইয়াছে। বক্ষমান পুস্তকের বর্ণিত বিষয়গুলি ইতিপূর্বে মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও মাওলানা মহিউদ্দীন শামীর সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিত যথাক্রমে মাসিক মদীনা (প্রতিষ্ঠিত ১৯৬১ ঈঃ) এবং মাসিক তাহজীব (১৯৭২-৭৮ ঈ) পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় পত্রস্থ হয়। তজ্জন্য আমি শ্রদ্ধেয় সম্পাদকগণের নিকট কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধগুলি এখন সামান্য সংক্ষেপিত করিয়া পরিমার্জিতরূপে অগণিত নবীপ্রেমিকের হাতে তুলিয়া দিলাম। আশা করি দেশবাসী তাওহীদী জনতা গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করিবেন।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বহু বৎসর যাবৎ একটি প্রকাশনী সংস্থায় আবদ্ধ ছিল। দেশের প্রখ্যাত নজরুল বিশেষজ্ঞ কবি সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭ ঈঃ) আশীষ বাণীসহ। তজ্জন্য গ্রন্থটি প্রকাশে বিলম্ব হইল।

ইতি—

মীরপুর, ঢাকা।

খাদেমুল ইবাদ

মোঃ আবুল কাসেম ভুঞা

দিশা

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—মুঃ মুনসুর উদ্দীন।

২। পুথি পরিচিতি—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
সম্পাদনায় ডঃ আহাম্মদ শরীফ।

৩। পুথি সাহিত্যের ইতিহাস— আঃ কাঃ মোঃ আদম উদ্দীন।

৪। পুথির ফসল—ডঃ আহাম্মদ শরীফ।

৫। ইসলামী বাংলা সাহিত্য—ডঃ সুকুমার সেন।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— (চতুর্থ খণ্ড) ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ।

৭। মুসলিম বাংলা সাহিত্য ডঃ মুঃ এনামুল হক।

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—সুলতান আহাম্মদ ভূঁঞা

৯। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ আনিসুজ্জামান।

১০। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—ডঃ কাজী আবদুল মন্নান

১১। সিলেটি নাগরী পরিক্রমা— চৌধুরী গোলাম আকবর

১২। মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—মৌঃ মোঃ আকরম খাঁ

১৩। প্রবন্ধ বিচিত্রা—সৈয়দ মতুর্জা আলী।

১৪। বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস—নাজিরুল ইসলাম মোঃ সুফিয়ান।

১৫। বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য—মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ।

১৬। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান— আবুল হাসনাত।

বিভিন্ন পুথি ও সাময়িকী।

সূচনা

পুঁথি বলিতে সাধারণতঃ আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দবহুল ছন্দোবদ্ধ ইসলামী ভাবসমৃদ্ধ বাংলাভাষায় রচিত এক বিশেষ ধরনের কাব্য-সাহিত্যকে বুঝায়। ইহা আমাদের সাহিত্যের এক বিরাট অংশ। ইহা চলতি ভাষায় বা 'সলিস' ভাষায় লিখিত। এই ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকে (ক) প্রেমমূলক কাহিনী কাব্য (খ) বীরত্বমূলক কাহিনী কাব্য (গ) ইসলাম মঙ্গল কাব্য (ঘ) সংস্কার ও শিক্ষামূলক কাব্য (ঙ) ধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ (চ) তর্ক-মূলক গ্রন্থ (ছ) ফকীরী বা দেহতত্ব (জ) ভৈষজ্য চিকিৎসা (ঝ) মন্ত্র চিকিৎসা (ঞ) সুফীতত্ব (ট) ইতিহাস (ঠ) ঐতিহাসিক কাব্যোপন্যাস (ড) জীবন চরিত (ঢ) জীবন চরিতের ছায়া (ণ) প্রহসন এবং (ত) ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যায়। জীবন-চরিত-মূলক গ্রন্থ-গুলিতে মহানবী (সাঃ), সাহাবাগণ (রাঃ) ও আউলিয়া-উলামাগণের জীবনী দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই সমস্ত জীবনী বিশেষ সতর্কতার সহিত লিখিত হয় নাই।

বাংলা কাব্যে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রসঙ্গ আসিয়াছে নানা ঐতি-হাসিক সূত্রে। পুঁথি তথা আখ্যানকাব্য ও আধুনিক বাংলা কাব্যে রসুল প্রসঙ্গের বিচিত্র রূপ যেন কাব্যরাজ্যের সর্বত্র বিরাজিত। আখ্যান তথা পুঁথি সাহিত্যে হজরতের জীবন কাহিনী বর্ণনা এবং চরিত্র-চিত্রণের ব্যাপারে বাংলার কবিরা আরবী এবং ফারসী কাহিনী কাব্যের ঐতিহ্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ সাধারণ মানুষের মত নবী-জীবনকে উপজীব্য করিয়া আখ্যানকাব্য রচনার ধারাটি ইতিপূর্বে আরবী ও ফারসী সাহিত্যে সুপ্রচলিত ছিল। আরবী ফারসী রোমান্টিক কাহিনী কাব্যের অনুবাদ সূত্রে বাংলার কবিরা নবী কাহিনী অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেন। আরবী-আখ্যান কাব্য 'কাসাসুল আম্বিয়া'র আদলে ইহার বাংলা রূপান্তর 'কাসাসুল আম্বিয়া' পুঁথি। আম্বিয়া কাহিনী রচনায় আমাদের পুথি সাহিত্যিকগণ সর্বত্র সরাসরি আরবীর দ্বারস্থ হন নাই, অনেক ক্ষেত্রে আরবী বা ফারসী কাহিনীর উর্দু রূপান্তরের অনু-

সরণ করিয়াছেন। ফলে রূপান্তরিত কাহিনীতে কোথাও কোথাও প্রক্ষিপ্ত রচনা আত্মগোপন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আবার ইহাও সত্য যে অনূদিত আম্বিয়া কাহিনীতে দেশজ রূপরীতি এবং ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ফলে আম্বিয়া কাহিনীর শাখা-প্রশাখায় এমন সব কাহিনীও সংযোজিত হইয়াছে যাহার চরিত্র মূলতঃ মানবীয় হইলেও অনেক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ। মধ্য যুগের মুসলমান কবিরাও নবী-কাহিনী ও অন্যান্য আখ্যান আরবী-ফারসী উর্দু কাব্যের অনুসরণে রচনা করেন। কারণ মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারা অনুসরণ না করিয়া তাঁহারা মানবীয় কাহিনী রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হইতেন না। আর বাংলা কাব্য তখন ছিল দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনে মুখর ও অলৌকিকতার ভারে আচ্ছন্ন। কোন কোন কবি আরবী-ফারসী হইতে আখ্যান গ্রহণ করিয়াও সংস্কৃতজ শব্দে মুসলিম চরিত্র-চিত্রণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কবি জৈন উদ্দীনের 'রসুল বিজয়' কাব্যের কথা উল্লেখ করা যায়।

নানা প্রসঙ্গে ও বিচিত্ররূপে মহানবী (সাঃ) পুথি সাহিত্যে উল্লেখিত হইয়াছেন। শুধু ধর্ম প্রবর্তক রূপেই নন, তিনি চিত্রিত হইয়াছেন মানুষ মোহাম্মদ (সাঃ) রূপেও। সার্বজনীন মানব ধর্ম ইসলামের প্রবর্তক হিসাবে এবং সত্যের ও ন্যায়ের অতন্দ্র সাধক নবী-রূপে তিনি যেমন বাঙ্গালী কবিদের চিত্তস্পন্দন জাগাইয়াছেন, তেমনইভাবে তাঁহাদের মনে এই বোধটিও অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে যে, বস্তুতঃ হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইলেন সৃষ্টির আদি ও মূল কারণ—তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্টি বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং তাহা পরিপূর্ণতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পুথিয়ালদের সার্বিক চেতনায় এই বোধটি প্রখর হইয়া আছে যে, যেহেতু হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) আদি সৃষ্টি এবং তাঁহার কারণেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনা; সুতরাং তাঁহার বন্দনাগীতে আত্মনিয়োগ এবং তাঁহার আনীত বিধানে সমর্পিতচিত্ততাই আল্লার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এই ধর্মীয় বিশ্বাস ও বোধ শুধু মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করে নাই, আধুনিক সমাজ সচেতন ও যুক্তিবাদী কবি-মনেও তাহার প্রভাবের জের চলিয়াছে। পরবর্তী কবিগণ (কবি মোজাম্মেল হইতে ফররুখ আহ্মদ পর্যন্ত) মুসলিম দৃষ্টি কোণ হইতে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করিতে গিয়া পুঁথি-সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছেন—পুঁথি সাহিত্যের সম্পদশালী অংশকে ভিত্তি করিয়া নবী চরিতের উপর কাব্য রচনায় এবং পুঁথি সাহিত্যের নবরূপায়নে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এমনকি পুঁথি সাহিত্যের শব্দসম্ভার, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, বাক-শৈলী ও চিত্র কল্পকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক আঙ্গিকে 'মরু-ভাস্কর', 'মরুসূর্য' প্রভৃতি কাব্য রচিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র আরবী-ফারসী শব্দ-সম্বলিত চলতি ভাষায় 'দোভাষী' পুঁথি-তেই নয়, মধ্যযুগের মুসলিম রচিত সমস্ত পুঁথিতেও হজরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মসম্বন্ধীয় ও নবী-কাহিনীমূলক পুঁথিতে যেমন মহানবীর পবিত্র জীবন-কাহিনী ও চরিত্র মাহাত্ম্য রূপ লাভ করিয়াছে, তেমনইভাবে বিবিধ বিষয়ের উপর রচিত পুঁথি যেমন প্রেমমূলক, যুদ্ধ বা বীরত্বমূলক, ধর্ম বা শিক্ষামূলক, দেহতত্ব বা সুফীতত্বমূলক, চিকিৎসামূলক তথা ঐতিহাসিক কাব্যোপন্যাসমূলক পুঁথির সূচনাতে কিংবা প্রসঙ্গান্তরে হজরতের প্রশংসা স্তুতি সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ কয়েকটি অ-নবীমূলক পুঁথি কাব্যে নবী প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হইল। ইহাতেই উল্লেখিত বিষয়ে পাঠক একটি সম্যক ধারণা পোষণ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রথম যুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি মুজাম্মিল লিখেন 'সায়াৎ নামা'। পরবর্তী শতকের কবি আফজল আলী (রচনাকাল—১৫৩২-৩৩ খৃঃ) রচনা করেন 'নসিহত নামা' শীর্ষক একখানি ইসলামী উপদেশমূলক গ্রন্থ। সেই সময় শাহ বারিদ খান (১৪৮০—১৫৫০ খৃঃ) রচনা করেন (ক) বিদ্যাসুন্দর (খ) রসুল বিজয় (গ) 'হানিফা ও কয়রা পরী' নামক পুঁথি-গুলি। শেষোক্ত গ্রন্থটি 'হানিফার দিগ্বিজয়' নামেও পরিচিত। ইহাতে রসুল প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ

"নূর মোহাম্মদ হৈলা যার হোন্তে পয়দা হৈলা
সৃষ্টি কৈলা এ তিন ভুবন।
যার হেতু নিরঞ্জন দুনিয়া করিল সৃজন
আকাশ পাতাল মর্ত্তস্থান।" এবং

"আউয়ালে আদম হৈলা খাক হোন্তে পয়দা কৈলা
আদম হোন্তে জাহের হৈলা।
যা হোন্তে সিফত হৈলা মোহাম্মদ নাম থুইলা
দোস্ত বলি পয়দা করিলা।"

সোনাগাজী রচিত "সয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল" নামক একটি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি দোনা-গাজী ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী কালে জীবিত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মহাকবি সৈয়দ আলাওল এই নামে একটি কাব্য রচনা করেন। মুন্সী মালে মুহাম্মদের প্রেমমূলক পুঁথিকাব্য 'সয়ফল-মুল্লুক বদিউজ্জামাল' এ আছে :—

আল্লা আল্লা বল ভাই দেলে জানি গাথি।
যে নামের বরকতে হবে আখেরে নাজাতি।।
তাহার মহিমা লিখে সাধ্য আছে কার।
ফেরেশতা আদম জ্বীন সকলে লাচার।।
যত পয়গম্বর আছে আল্লার মকবুল।
আখেরী নবীর হবে শাফায়াত কবুল।।

ষোড়শ শতকের অন্য কবি শায়খ ফয়জুল্লাহ (রচনাকাল ১৫৪৫খৃঃ) ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন কবি। তিনি ১। গোরক্ষ বিজয় ২। গাজী বিজয় ৩। সত্যপীর ৪। জয়নালের চৌতিশা ৫। রাগমালা নামক পাঁচ-খানি পুথি রচনা করেন। 'সত্য পীর' সম্পর্কে ভারত চন্দ্র, তাহির মাহমুদ প্রমুখ হিন্দু মুসলমান অনেক কবি পুথি রচনা করেন। 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যে কবি ফয়জুল্লাহ সৃষ্টি প্রকরণ লক্ষ্য করেন এইভাবে—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
নিয়মে সৃজিলা প্রভু সকল সংসার।।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন।
নানারূপে কেলি করে নাজাএ লক্ষণ।।
তবে প্রণমিয়ে তান্ নিজ অবতার।
নিজ অংশে সৃজিলেক হুইতে প্রচার।।… …

আকাশ পাতাল মধ্যে সৃজন করিয়া।
আদ্য আছেন্ত অনাদ্য আহুতিয়া।।
সৃষ্টিকে স্থাপিয়া আদ্য অনাদ্যের বেশে।
যোগ পরিচয় হেতু এক স্থানে বৈসে।।

উপরোক্ত বর্ণনায় 'করতার' ও 'অবতার' যে যথাক্রমে 'আদ্য' ও 'অনাদ্য' তাহা বুঝিতে ব্যাখ্যার আবশ্যক করে না। এই আদ্য-অনাদ্যের প্রসঙ্গে হায়াত মামুদ (মৃঃ ১৭৬৩ খৃঃ) বলিয়াছেন ঃ—

আমরা আহাদ কহি, হিন্দু কহে আদ্য।
আহাম্মদ কহি মোরা, হিন্দু সে অনাদ্য।।
—পুঁথি ঃ 'হিতজ্ঞান বাণী।

আদ্য-অনাদ্যের কথা রামাই পন্ডিতের 'ধর্মপূজা বিধানে'ও আছে। যেমন—

"'আদ্যের পুষ্পগাছি নাঞি তার পাত।
আপনি নিরঞ্জন তাহে দিলা পদ্মহাত।।
o o o
তবে ধর্মকর্ম মর্ত্যে হবেক প্রকাশ।
রহিল রামাঞি পন্ডিত অনাদ্যের দাস।"

'ধর্মপূজা বিধান'-এর দেবদেবীর স্তুতি-লাঞ্ছিত গাথা গান বাংলার মুসলমান বহুদিন শ্রবণ করিয়াছেন। মহাকবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০—১৬৪৮ খৃঃ) সে ধারার মোড় পরিবর্তন করিয়া বাংলা কাব্যে পবিত্র ইসলামী আদর্শ প্রবর্তনের প্রয়াস পান। মহানবীর বিশাল পবিত্র জীবনী নিয়া তিনি অনেকগুলি পুঁথি রচনা করেন। তাহা ছাড়া তিনি 'ইবলিসনামা', 'জ্ঞানচৌতিশা' 'জ্ঞানপ্রদীপ' এবং মারফতী গান ও পদাবলীও রচনা করেন। তাঁহার 'জ্ঞানপ্রদীপ' কাব্যের প্রথমে আছে 'প্রভুর নাম'। অতঃপর—

দ্বিতীএ লই নাম মুস্তফা পয়গম্বর।
যাহার সিফত আছে রোজ মহাশর।

যতন করি ধরি এ রসুলে দুই পাএ।
আখেরে এড়াইবা যদি হিসাবের দাএ।

সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ' ও শায়খ চান্দের 'শাহদৌলা পীরের পুথি' প্রভৃতিতে যোগ শাস্ত্রের প্রভাব স্বভাবতঃই কল্পনাকে জটিল তত্ত্বের গহনে নিমগ্ন করিয়াছে এবং এই গোত্রের লেখকেরাই আধ্যাত্মিক ভাবের আমেজ দিয়া নবী-প্রশস্তিতে কিছু বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছেন। হাজী মোহাম্মদ (১৫৫৫—১৬২০ খৃঃ)-এর 'নুর জামাল' হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দেখুন—

জাত ছিফাত সেই নুর অনুপাম।
নুর মুহাম্মদ তান্ রাখিলেক নাম।।
আপনার দোস্ত হেন তাঁহাকে বুলিলা।
সেই নুর হোন্তে আল্লাহ সকল সৃজিলা।
এক হোন্তে হৈল দুই, দুই হোন্তে সকল।
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।।
ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হএ।
একে হএ তিন জান তিনে এক দুএ।।
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহ ভিন্ন নএ।
তথাপি ফলের বৃক্ষ কহন না যাএ।।
তুহ্মি আহ্মি নাম মাত্র, সকল সেই সে।
নানারূপে কেলি করে নানান যে বেশে।।

হাজী মোহাম্মদ 'ছুরত নামা' শীর্ষক একটি পুথিও রচনা করেন। তিনি একজন বড় আলেম ও সুফীতত্ত্ববিদ ছিলেন। 'নুর জামাল'-এ তিনি নুরের মতবাদ তথা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু কোরআনে এই সর্বেশ্বরবাদ বা 'হামাউস্ত' মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

ষোড়শ শতকের শায়খ পরাণ (১৫৫০—১৬১৫ খৃঃ) লিখেন 'কিফায়াতুল মুসল্লীন', নুরনামা' ও 'নসিহত নামা' পুথিগুলি। কবি নসরুল্লাহ খান (১৫৬০—১৬৪৫ খৃঃ) রচনা করেন 'জঙ্গনামা', 'মুসার সোয়াল',' শরীয়ত নামা' ও 'হিদায়াতুল ইসলাম' নামক কাব্য। "হিদায়াতুল ইসলাম' কাব্যে মুসলমান-

গণকে অমুসলিম ও শরীয়ত বিরুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কাব্যখানির শুরুতে আছে ঃ—

আর এক কথা কহি আমি রঙ্গমনে।
জেই কর্ম না করিব মুহম্মিনগণে।।
জে সকল কর্মে মোহাম্মদ অসন্তোষ।
হিছাবের কালে প্রভু করিবেন্ত রোষ।।

কবি মোহাম্মদ কবীর (রচনাকাল ১৫৮৮ খৃঃ) রচনা করেন মধুমালতী' কাব্যটি। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে আরও পাঁচজন কবি পুথি রচনা করিয়াছেন। শেখ চান্দ (১৫৬০—১৬২৫ খৃঃ) রচনা করেন 'রসুল বিজয়', 'শাহদোলা পীর', 'কেরামত নামা' 'হরগৌরী সংবাদ' ও 'তালিব নামা' নামক পুস্তকগুলি। 'তালিব নামা'র প্রথমে আছে "আল্লাহু গনি। মুহাম্মদ নবী।।" পরবর্তী কবি মুহাম্মদ ফসীহ ১৮১২ সালের দিকে রচনা করেন "আরবী ত্রিশ হরফে মোনাযাত" সংক্ষেপে 'মুনাযাত' পুথিটি। ইহার প্রথমেই রহিয়াছে—"আল্লাহু গনি মোহাম্মদ নবী" কথাগুলি। ত্রিশ হরফের ২৪ নম্বর অক্ষর 'মীম'-এর বিপরীতে কবির মুনাজাত নিম্নরূপ—

মোহাম্মদ রসুল প্রভুর সখাবর।
মানিলুম তাহান দীন হরিষ বিস্তর।।
মুনাযাত করি আমি চরণে নবীর।
মনের আবেশ আপে পুড়াইয়া শিগ্গির।।

মাওলানা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪—১৪৯২ খৃঃ) ফারসীতে লায়লী মজনু'র প্রেমকাহিনী প্রণয়ন করেন। তাহার পূর্বে শেখ নিজামী গঞ্জভী (১১৪০—১২৩০ খৃঃ) এই জনপ্রিয় আজব কাহিনীটি লইয়া মসনভী লিখিয়াছিলেন। নিজামীর অনুসরণে দিল্লী শাহী দরবারের কবি হযরত আমীর খসরু (১২৫৪—১৩২৫ খৃঃ) তাঁহার চতুর্থ রোমান্টিক মসনবী 'মজনু-লায়লা' রচনা করেন। ইহা ছাড়া আরও সাতটি গ্রন্থ এই বিষয়ে ফারসীতে পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি হইতে উপকরণ লইয়া দৌলত উজীর বাহরাম খান (কাব্যকাল ১৫৬০—৭৫ খৃঃ) বাংলা ছন্দোবদ্ধে তাঁহার বিষাদান্ত কাব্য 'লায়লী মজনু' রচনা

করেন। তাহাতে "প্রণামহু, আল্লা" নিবেদনের পর এক দীর্ঘ নাত পরিবেশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে ঃ—

প্রণামহু তান সখা মহাম্মদ নাম।
এ তিন ভুবনে নাহি যাহার উপাম।।
আদি অন্তে মহাম্মদ পুরুষ অতুল।
স্থল শূন্য না আছিল, আছিল রসুল।।
আকাশ-পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন।
যার প্রেম রস হন্তে হইতেছে সৃজন।
উম্মত সহায় তুমি পরম সারথী।
পাপ তাপ আপদেত তুমি মাত্র গতি।।
নুরনবী কান্ডারী আছএ যেই না এ।
সাগর তরঙ্গ-ভয় নাহিক তথা এ।।

বাংলায় অন্ততঃ সাতজন পুথিকার এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবি বাহরাম খানের অন্যতম কাব্যগ্রন্থের নাম 'হানিফার বিজয়' এবং 'কারবালা বা মাকতাল হুসায়ন'। 'মাকতাল হুসায়ন' নামক গ্রন্থের আরও তিনজন অনুবাদক বা রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় ঃ—১। মুহাম্মদ খান ২। মুন্সী শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহ ও ৩। কবি হায়াত মাহমুদ। কারবালার হৃদয়বিদারক কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত নায়েব উজির মুহাম্মদ খান (১৫৮০--১৬৫০খৃঃ)-এর 'মাকতাল হুসায়ন' সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার। মুহাম্মদ খানের প্রথম রচনা ঃ 'সত্য কলি-যুগ সংবাদ' (১৬৩৫ খৃঃ) হিন্দুয়ানী প্রভাবিত একটি প্রতীকী কাব্য। ইহাতে রসুল-প্রশস্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও আন্তরিকতাপূর্ণ—

"নিরঞ্জন চিনিবারে নবী মাত্র লক্ষ্য।
নহে প্রভু চিনিবারে কার আছে সক্য।।
দর্পনে দেখি এ যেন আপনা বদন।
নবীকে ভাবিলে পাই প্রভু নিরঞ্জন।।
দন্ডবৎ হই পরি নবীর চরণ।
উদ্ধার করহ প্রভু পশিলু শরণ।।"

কবির 'মাকতাল হুসায়ন' এ নবী প্রশস্তির নমুনা ঃ—

মুহাম্মদ নবী নাম হৃদয়ে গাথিয়া।
পাপীজন পরিণামে যাইবে তরিয়া।।
দয়ার আধার নবী কৃপার সাগর।
বাখান করিতে তার সাধ্য আছে কার।।
যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আপে নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি করিলেক এ চৌদ্দ ভুবন।।
অনিল সলিল সূর্য এ নভোমণ্ডল।
হজরত কারণে সৃষ্টি জানহ সকল।।
বন্দনায় নবী পদ নির্ণয় না হয়।
এ কারণে গুণীগুণ ক্ষান্ত দিল তায়।।

'মাকতাল হুসায়ন' মহাভারতের অনুকরণে একাদশ পর্বে বিভক্ত। কবি গ্রন্থের শুরুতেই ছন্দে পর্বগুলির সূচী দিয়াছেন। শাহ গরীবুল্লার 'মাকতাল হুসায়ন' বা 'জঙ্গনামা'র বঙ্কিমী ভাষার সংস্করণ মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রচিত কবি আবদুল বারি কবিরত্নের 'কারবালা' একটি আখ্যান কাব্য। এই কাব্যে নবীন চন্দ্র সেনের কাহিনী কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর ছাপ পড়িয়াছে। বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি 'বিষাদ সিন্ধু' হইতে গৃহীত।

ইউসুফ জোলায়খার প্রেমোপাখ্যান কাহিনীটি ফারসীতে আবুল কাসেম ফেরদৌসী (৯৩৬—১০২৬ খৃঃ) 'আহসান আল কসস' নামে মসনভী আকারে এবং শেখ আবু ইসমাইল আবদুল্লাহ আনসারী (১০০৬—১০৮৮ খৃঃ) গদ্য রীতিতে পরিবেশন করেন। কিন্তু মাওলানা জামী রচিত ফারসী মসনভী 'ইউসুফ জোলায়খা' সমধিক প্রচার লাভ করে। এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম শাহ মোহাম্মদ সগির (১৩৩৯—১৪০৯ খৃঃ) গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্ব কালে (১৩৯৭—১৪১০ খৃঃ) 'ইছুফ জলিখা' কাব্য রচনা করেন। কবি শাহ মুহাম্মদ গরীবুল্লাহও 'ইউসুফ জোলায়খা' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। মোঃ সগিরের 'ইছুফ জলিখা' গ্রন্থের প্রারম্ভে বিভুস্তুতির পর নবী-প্রশস্তি কীর্তিত হইয়াছে এইভাবে ঃ—

জীবাত্মায় পরমাত্মা মুহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম।।
যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন।
মহাম্মদ হস্তে কৈলা তা সব রতন।।
নিরঞ্জন একারক প্রেমে সে মজিলা।
এহি লক্ষ্যে যত জীব সৃজন করিলা।।
পরম ঈশ্বর তানে বলিলেক বন্ধু।
সপ্ত স্বর্গ মুক্তি পায় তান পদবিন্দু।।
তান প্রেম অনুভাবে সৃজিলা জগৎ।
কহিতে পারি এ কত তাহান মহত্ত্ব।।
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবিকুলে।
মুহাম্মদ সকল প্রধান আদ্যমূলে।।

হিন্দু আখ্যায়িকা অবলম্বনে দৌলত কাজী 'দেশী ভাষে পাঞ্চালীর ছন্দে' তাহার অসমাপ্ত কাব্য 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' প্রণয়ন করেন। কবি সাধন কর্তৃক 'ঠেঠ' হিন্দী ভাষায় চৌপদী 'দোহাছন্দে' বিরচিত 'মৈনা সত' ছিল তাঁহার আদর্শ। 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' এর প্রথম অধ্যায় 'বন্দনা'। তাহার শেষ চারি ছত্র—

"মুহাম্মদ আল্লার রসূল সথাবর।
যাঁর নূরে ত্রিভুবন করিছে প্রসর।।
শ্যাম তনু জ্যোতির্ময় সর্বাঙ্গ দার্পণি।
নবুওত পৃষ্ঠে যেন জ্বলে দিনমণি।।"

অতঃপর দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে দ্বাদশ শ্লোকে 'মুহাম্মদের সিফত'। তাহার তিনটি শ্লোক—

"আল্লার দোস্ত মুহাম্মদ, মানহ তাহান পদ
দরূদ সালাম বহুতর।
তাহান চরণধূলি সর্বাঙ্গে চন্দন মলি,
জুড়াউক পরাণী কাতর।।

সাংসারিক দয়া-ধর্ম সকলি নবীর কর্ম
নবীসূত্র যা হন্তে সমাপ।
অঙ্গুলি ইঙ্গিত শরে শশী দুই খন্ডে করে
প্রলয় সমান তান দাপ।।
সেবহ রসূলে অতি বুরাক বাহন গতি
জিব্রাইল যাহার জোগান।
আল্লার হুজুরে যায় জুযায় দর্শন পায়
প্রেমভাবে সর্বাঙ্গে নয়ান।।"

এই পুঁথিতে মহানবীর 'মোহরে নবুওত', 'চন্দ্র বিদারণ' (শক্কুল কমর) ও মিরাজ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে এবং তাঁহাকে 'খাতামুন্নবীঈন' অর্থে শেষ নবী বলা হইয়াছে।

সপ্তদশ শতকের অন্যান্য কবি যেমন মরদন, কুরায়শী মাগন ঠাকুর, শায়খ মুত্তালিব, আবদুল করিম খন্দকার, আবদুল হাকিম, নওয়াজিস খাঁ, সাইয়িদ মুহাম্মদ, আকবর আলী, আবদুন নবী, আবদুস শুকুর, কবি আরিফ প্রমুখ বহু পুঁথি রচনা করিয়াছেন। ইহাদের প্রথমে প্রসঙ্গক্রমে মহানবীর প্রশস্তি আসিয়াছে। এই শতকের শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল (১৬০৭—১৬৮০ খৃঃ)। মহাকবি আলাওল রচনা করেন—১। পদ্মাবতী ২। সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানীর শেষাংশ ৩। সপ্ত পয়কর ৪। তোহফা ৫। সায়ফলমুল্লুক বদিওজ্জামাল ও ৬। সিকান্দর নামা। আখেরী নবী হাশরে তাঁহার উম্মতের শাফায়াত করিবেন, এই তত্ত্বটি 'পদ্মাবতী' কাব্যে অধিকতর স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে—

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার।।
নিজ সখা মুহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই জ্যোতিমূলে ত্রিভুবন নিরমিলা।।
তাহান পীরিতে প্রভু সৃজিলা সংসার।
আপনে কহিছে প্রভু কোরান মাঝার।... ...

জন্মিয়া যে জনে না লইল তাঁর নাম।
তাহার হইব নরকের মাঝে ঠাম॥
পাপপুণ্য যখন পুছিব করতার।
আগু হৈয়া করিবেক নারকী উদ্ধার॥

'পদ্মাবতী' কাব্যে যে বিভুস্তোত্র স্থান পাইয়াছে, তাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নাই। আলাওলের পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ রচনাঃ 'সপ্তপয়কর'—শেখ নিজামী গঞ্জভীর—'হফত পয়কর' (১১৯৮ খৃঃ) অবলম্বনে বিরচিত। তাহাতে অন্তর্ভুক্ত রসুল প্রশস্তি—

জ্যোতির সমুদ্রে আদ্যে নূর মুহাম্মদ।
জগৎ-বিজয়ী হৈতে পাইল সম্পদ॥
সপ্ত স্বর্গ উদ্যানের আদ্যে নব ফুল।
বুদ্ধি বাক্য শিরোমনি ভুবনে অতুল॥
সেই পুষ্প হৈতে আদ্যে আদম উজ্জল।
সকল কদর্য্যপূর্ণ, সেই সে নির্মল।
ভুবন বিখ্যাত নবীকুল ছত্রপতি।
শরীয়ত জ্ঞান তাঁর প্রভু পাশে গতি।
বিনা পাঠে সর্ব শাস্ত্র হইয়া বিদিত।
আর্শের পরম কর্তা থাকে পৃথিবীত।
সূর্য্য জ্যোতি সম ধবল অঙ্গছায়া।
সংসারে কে আছে আর ছায়াহীন কায়া।

আলাওলের অনন্য গ্রন্থ 'তোহ্‌ফা'। 'ইহা দিল্লীর শেখ ইউসুফ গদার ছন্দোবদ্ধ ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে উপদেশ গ্রন্থ 'তোহফাতুল নাসাঈ' (১৩৯২—৯৩ খৃঃ) এর অনুবাদ। ইহাতে রসুল প্রসঙ্গ দেখুন—

শিরেত লৌলাক ছত্র প্রসঙ্গ অমূল।
ডাকুয়া সমান সঙ্গে যথেক রসুল॥
যাবতে না যাবে নবী বেহেশ্‌ত মাঝারে।
যথেক রসুল নবী থাকিবেক ঘরে॥

হেন মুহাম্মদ নবী সংসারের সার।
স্বর্গ মর্ত্য-পাতালে সমান নাই যার॥
পাতকী তরান হেতু অবতার পূর্ণ।
গিরিসম পাতক স্মরণে হয় শূন্য॥
নবীকুল কেরামত ক্ষিতিতে প্রচন্ড॥
আকাশের শশী করিলা দুই খন্ড॥

"লাও লাকা লামা খালাকতুল আফলাক" এই হাদীসটির অর্থ ও মর্মবাণীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এখানে।

আলাওলের সর্বশেষ রচনা 'সিকান্দার নামা'—ইহারও মূল নিজামীর ফারসী 'সিকান্দার নামাহ' (১১৯১ খৃঃ)। আলাওল তখন জরাতুর; কিন্তু সেই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার ভাষা খুবই বলিষ্ঠ ছিল। যেমন—

আপনার ঈশ্বরতা প্রচার লাগিয়া।
নিজ অংশে সৃজে মিত্র পূণ্যরস দিয়া॥
অলখা লখিতে নারে বিনে দিব্য আক্ষি।
তেকারণে মিত্র-মূর্তি নিজরূপ সাক্ষি॥
দরুদ অনেক কহি যেন মুক্তাবৃষ্টি।
যাঁর ভাবে ঈশ্বরে সৃজিল সব সৃষ্টি॥

সাধক কবি সৈয়দ মর্তুজা (১৫৯০—১৬৬২ খৃঃ) বহু মারফতী পদে আপন মনের আর্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সহজিয়ার লীলাবাদ তাঁহার ভাবের বড় আশ্রয় হইলেও তিনি রসুলচরণে সালাম নিবেদন করিয়াছেন চিরাচরিত রীতিতেই—

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
তান পাছে প্রণামিএ রসুল আল্লার॥
মুখ্য চারি ফিরিস্তারে করি এ প্রণাম।
সহস্য সহস্য তান পদেত ছালাম॥

—(পুঁথি : যোগ কলন্দর)।

ইশারী অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাংলা দ্বাদশ শতকে একশত পুঁথিকার কয়েকশত কাব্য রচনা করেন। এই সব পুঁথিতে চিরাচরিত প্রথানুসারে আল্লাহ ও রসুলের নামোল্লেখ হইয়াছে। এই শতকের মরমীয়া কবিগণের মধ্যে আলী রাজা ওরফে কানু ফকীর (১৬৯৫—১৭৮০ খৃঃ) এক বিশিষ্ট আসনের দাবী-দার। তাঁহার তত্ত্বদর্শনের অতলে সংগুপ্ত এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ। তিনি বাউলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় 'জ্ঞানসাগর'; ধর্ম-সম্বন্ধীয় 'সিরাজকুলুব'; সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 'ধ্যান মালা'; 'আগম' ও 'ষটচক্রভেদ' পুঁথি রচনা করেন। আল্লাহ রসুল সম্বন্ধে তাঁহার গুহ্য ব্যাখ্যা—

এক প্রভু নিরঞ্জন এক ডিম্ব ত্রিভুবন
এক তনু সকল জগৎ।
এক মোহাম্মদ মুখ্য ত্রিভুবনে এক বৃক্ষ
ডাল ফল হয় নানা মত ॥
সর্ব জগ এক সিন্ধু নানারূপ জলবিন্দু
সর্বস্থানে আছে ব্যক্তময়।
যথা তথা রহে বারি চলে সর্বস্থান ছাড়ি'
সর্ব গিয়া সাগরে মজ্জয় ॥

—(পুঁথি : জ্ঞানসাগর)।

আলী রাজার পূর্বসূরী হায়াত মামুদ (১৬৮০—১৭৬৩ খৃঃ) রচনা করেন 'জঙ্গনামা বা মহরম পর্ব'; 'সর্বভেদবাণী'; 'হিতজ্ঞানবাণী'; ও 'আম্বিয়া-বাণী' পুঁথিগুলি। তিনি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর ভাষায় মারফতী প্রতীকের ছক ফাঁদিয়া আল্লাহ-রসুলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। তিনি কল্পনা করেন যে, "পরম সাঁই এক নূর দুই ঠাঁই" করিলেন এবং "নবী মহাম্মদ আহাম্মদ হইলেন "আহাদ হইতে উপাদান লইয়া"—

আহাদ একবিনে আল্লা নাহিক দোসর।
সৃজন পালন হেতু যেই সর্বেশ্বর ॥
আহাদ হৈতে আল্লা কৈল আহম্মদ।
সীমাধিকে পূর্ণ সেই কৈল মহাম্মদ।

আহাদ আহমদ দুই এক করি জান।
মীমে মহাম্মদ শেষে কৈল উপাদান ॥
স্বর্গেতে সকলে জপে নাম আহম্মদ।
মর্ত্যপুরে জপে লোক নাম মহাম্মদ ॥
পাতালে মামুদ নাম জপে নাগগণে।
এক মীমে তিন নাম হৈল ত্রিভুবনে ॥

—(পুঁথি : হিতজ্ঞান বাণী)।

'আহাদ' ও 'আহমদ' এর মাঝে আছে শুধু মীমের পর্দা, এইরূপ তত্ত্বকথা বাংলার বাউল কবিগণের মুখেও উচ্চারিত হইয়াছে। লালন শাহ, পাগলা কানাই, শেখ ভানু, মংগল শাহ, মুসলিম শাহ প্রভৃতির দেহতত্ত্বমূলক গানে এই ধরনের বুলি ধ্বনিত হইয়াছে। লালন শাহ (১৭৭৪—১৮৯০ খৃঃ) বলেন—

"সাকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা।
আহাদের আহমদের বিচার হৈলে যায় জানা ॥
আহমদ নামেতে দেখি মীম হরফ লেখে নবী,
মীম গেলে আহাদ বাকী আহাম্মদ নাম থাকে না ॥
খুঁজিতে বান্দার দেহে খোদা সে রয় লুকাইয়ে।
আহাদে মীম বসাইয়ে আহম্মদ নাম হলো সে না ॥"

প্রেমতত্ত্বের বেসাতি বাউলের বড় সাধনা। সৃষ্টির মায়া ও স্রষ্টার লীলা ব্যাখ্যাচ্ছলে তাঁহারা আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানে পাগলা কানাই (১৮১০—৯০ খৃঃ) অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পালা গানের বয়াতি ও জারি গানের গাএন হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। তিনি বলেন—

পিরীতের আলোকে রসুলুল্লাহ কর্য়া গেছে জগৎ উজ্জালা
সে পিরীত জানেন সেই বারিক আল্লা!
তাই এ ভবে এসে তাঁর চরণ কর্যাছি সার—
ভব-দরিয়ায় রসুল হইবে কান্ডার॥

এই বাউল বয়াতির যুগেই বাংলার পল্লীতে আরবী ফারসী-উর্দু মিশাল বাংলা জবানে রচিত মুসলমানী পুঁথির প্রচলন হইয়াছিল সর্বাধিক। এই মিশ্র ভাষার আদি কবি শাহ গরীবুল্লাহ ১৭৬৬ সালে 'ছহিবড় আমীর হামজা' প্রথম পর্ব রচনা করেন। তাহার প্রারম্ভে আছে—

"একা সেই করতার কেহ নাহি ছিল আর
নূরে নবী কৈল পয়গম্বর।
আপনার নূর দিয়া পহেলায় পয়দা কিয়া
মেহের বড় হৈল তার পর।
এলাহি বুঝিয়া কাম রাখিলা তাঁহার নাম।
নূরনবী নূর মহাম্মদ।
সেই ত নবীর নূরে পয়দা কৈল সবাকারে
চৌদ্দ ভুবন হদাহদ ॥
সেই দোস্ত বড় তাঁর এয়ছা কেহ নাহি আর
জেবা কেহ আছে তাঁর দ্বীনে,
তাহাকে করার এই বেহেস্তখানা পায় সেই
ফকির গরীব শাহা ভণে ॥"

হায়াত মামুদের উত্তরসূরী দোভাষী বাংলার প্রথম পথিকৃৎ শাহ গরীবুল্লার এই মিশ্র ভাষাই ছিল পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খৃঃ) পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যের সাধারণ ভাষা। এই ভাষাতেই সৈয়দ হামজা (১৭৫৫—১৮১৫ খৃঃ) তাঁহার অসম্পূর্ণ কাব্য 'আমীর হামজা' ১৭৯৪ সালে সমাপ্ত করেন। সৈয়দ হামজার চতুর্থ ও সর্বশেষ রচনাঃ 'হাতেম তাই'। তাহার সূচনায় রসুল প্রশস্তিতে বলা হইয়াছে—

"একেলা আছিল যবে সেই নিরঞ্জন
আপনার নূরে নবী করিল সৃজন ॥
মহাম্মদ নামে নবী সৃজন করিয়া
আপনার নূরে তারে রাখে ছাপাইয়া ॥

দুনিয়া করিল পয়দা তাহার কারণ
আসমান জমিন আদি চৌদ্দভুবন।।
সেই যে নবীর নূরে তামাম আলম
বেহেস্ত দোজখ আর লওহ কলম।।
পয়গম্বর এক লাখ চব্বিশ হাজার
তার দিকে মুহাম্মদ সবের সরদার।।"

উপরোক্ত প্রশস্তির বাকসৌন্দর্য পাঠক চিত্তকে তেমন উদ্দীপিত করে না। ইহার কারণ হয়ত পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাংগালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের অধোগতি। আর সেই কারণেই শতবর্ষ পর্যন্ত মুসলিম বাংলা সাহিত্যে কোন গগণস্পর্শী প্রতিভার আবির্ভাব দেখা যায় নাই। অথচ এই সময় অন্য সমাজে বহু প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তব রূপ ধারণ করে এবং সে বৎসরই মে মাসে সিপাহী বিপ্লব আরম্ভ হয়। পূর্ব হইতেই সেইজন্য সমাজের শিক্ষিত ও শোষিত স্তরে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল। এই জাগরণের মুখে ১৮৫৩ সালে খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮—৭০ খৃঃ) তাঁহার 'ভাব লাভ' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার শুরুতে মর্তভূমিকে বন্দনা করা হইয়াছে। ইহাতে আরও আছে—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রসূল-চরণ।।
তৃতীয়ে প্রণাম করি ফিরিস্তাগণ।
চতুর্থে প্রণাম করি এ তিন ভুবন।।

কবি সিদ্দিকী 'উচিত শ্রবণ' ও 'সুরতজান' নামেও দুইটি পুথি রচনা করেন। তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য শক্তিধর পুথিকার হইলেন মোহাম্মদ আমীরুল্লাহ, মোহাম্মদ মুসা মিয়া, মনির উদ্দীন, জহির উদ্দীন, জামাল উদ্দীন, আবদুল মজিদ, সমির উদ্দীন আহমদ, খোয়াজ ডাক্তার, হায়দার জান, সৈয়দ জান, আবদুর রহমান, আয়েন আলী, হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ। কিন্তু

সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান হয় নাই বলিলেই চলে। অথচ তাহারাও শেষ নবীর চরণে শ্রদ্ধার্ঘ জানাইয়া কলম ধরিয়াছিলেন।

বাংগালী মুসলমানকে ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ১৮৫৬ সালে মুন্সী মালে মোহাম্মদ রচনা করেন 'আহকামোল জোমা'— জুমার বিধান সংক্রান্ত পুঁথি। তাজউদ্দীন মোহাম্মদ ও খাতের মোহাম্মদ (১৮৩৯–৯১ খৃঃ) ফারসী হইতে অনুবাদ করেন ষোল খন্ড "খোলাসাতুল আম্বিয়া" নামক গ্রন্থটি।

সিপাহী বিপ্লবের বৎসর (১৮৫৭ খৃঃ) মুন্সী জান মোহাম্মদের 'হাজার মসলা', গরীবুল্লার 'ইবলিশনামা,' জয়নুল আবেদীনের 'ছহি বড় শানামা', ফকীর মোহাম্মদের 'ইমাম চুরি', মোহাম্মদ দানেশের 'গুল ও ছানোয়ার', মোহাম্মদ এবাদুত খাঁর 'সুরুজ'-উজাল বিবির কেচ্ছা', এবাদতউল্লার 'কুরঙ্গভানু' প্রভৃতি বহু পুঁথি প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ সালে মোহাম্মদ সাঈদের উর্দু গ্রন্থের অনুসরণে রেজাউল্লাহ, আমিরুদ্দীন ও আশরাফ আলী ৫৬৮ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ-'কাছাছোল আম্বিয়া' প্রণয়ন করেন। উনবিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান পুঁথিকার খাতের মোহাম্মদ রচনা করেন একুশখানা গ্রন্থ। তিনি ফেরদৌসীর 'শাহনামা' অনুসরণে ১৮৭৫ সালে 'ছহিবড় শাহনামা' রচনা করেন। ইহাতে আল্লার গুণ বর্ণনার পরে বলা হইয়াছে—

"ফের আমা সবাকারে রাহা বাতাবার তরে
মেহের করিয়া নিজ গুণে।
আপনার নূর দিয়া নূর-নবী পয়দা কিয়া
ভেজিলেন দুনিয়া জাহানে।।
যাঁর শানে কৈলা সবি, কি কব তাঁহার খুবি,
দরুদ ছালাম তাঁর পরে।
তাঁহার আওলাদ আর যে কেহ ছাহাবা তাঁর
ছালাম তছলিম সবাকারে।।"

১৮৭৬ সালে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১৮৪৮–১৯০৩ খৃঃ) তাঁহার অপূর্ব আখ্যানকাব্য 'রূপজালাল' প্রকাশ করেন। ইহাতে বন্দনা অংশ নিম্নরূপ ঃ—

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
যাঁহার সৃজন হয় এ তিন ভুবন।।
তৎপরে বন্দনা করি নবীর চরণ।
যাঁহার প্রভাবে হবে অন্তিমে তরণ।।
রছুল বিহনে গতি নাহি মুক্ত হতে।
সে পদ ভাবহ সবে কায়মনোচিতে।।
নিজ নূরে নিরঞ্জন নবীকে সৃজিয়ে।
ত্রিজগৎ নির্মিলেন তাঁর নূর দিয়ে।
কৃপা করে গুপ্তভাবে রাখি মুক্তাবনে
সব নবী পরে রাষ্ট্র করে এ কারণে।
মহাম্মদি দ্বীন পরে প্রকাশ সবায়।
হাশর যাবৎ ইচ্ছা স্থিতি রাখিবায়।"

এই সময় চলতি বাংলা জবান ব্যবহার করিয়া অনেক মর্সিয়া কাব্য রচিত হয়। ১৮৮২ সালে জনাব আলী (রচনাকাল ১৮৬২—৯৩ খৃঃ) ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে 'শহীদে কারবালা' রচনা করেন। ইহাতে রসুল প্রশস্তি—

"নূর নবী পাক মহাম্মদ।
যত আর নবী হৈল এয়ছা দরজা না পাইল,
তেনা হৈতে পয়গম্বরী হদ্।
সে নবীর নূরে খোদা সকলি করিল পয়দা,
যত দেখ জমিন আসমানে।
সে সব বয়ান ভারি কোরানেতে আছে জারি,
ফরমিয়াছে পাক সোবহানে।"

সা'দ আলীর যুদ্ধ ও বীরত্বমূলক কাহিনী কাব্য "শহীদে কারবালা' এর সূচনাতে নবীপ্রসঙ্গ নিম্নরূপ ঃ—

"দিয়া নিজ নূর করিল জহুর
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী।।
আখেরী রসুল খোদার মকবুল
কি লিখিব তার খুবী।।

যাহার নূরেতে কুল মখলুকাতে
পয়দা করে পরওয়ারে।।
তারিফ তাঁহার সাধ্য কি আমার
লিখি যে বয়ান করে।।"

জনাব আলীর পঞ্চদশ ও শেষ গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' দুই খন্ডে সমাপ্ত। ইহাতেও এলাহির তারিফ ও নবীপ্রশস্তি আসিয়াছে। ইহার কিয়দংশ নিম্নরূপ—

"কি সাধ্য আদমের আছে যাইতে তাঁহার কাছে
হাল তাঁর দরিয়াপ্ত করিবে।
এ খাতিরে আল্লাতালা মৌছিতে সে জন্বালা
মোস্তফাকে আনায় এ ভবে।।
হাদি বানাইয়া তায় পাঠাইল দুনিয়ায়
কোরান আইন তানে দিয়া।
কি কব সে সব খুবি কোরান লইয়া নবী
রাহা দিলেন বাতাইয়া।।"

১৮৮৩ সালে আজিমুদ্দীন আহমদ, জনাব আলী ও মহাম্মদ মুসা এজমালীতে প্রণয়ন করেন 'মজমুয়ে ফহতুশ্বাম'। বিখ্যাত আরব ইতিহাসবিদ আবু আবদুল্লাহ বিন ওমর আল ওয়াকিদি (৭৪৭—৮২৩ খৃঃ) প্রণীত 'ফতুহ-আল-শাম ওয়াল ইরাক' (সিরিয়া ও ইরাক বিজয়) এবং 'ফতুহ আল-বুলদান ওয়াল মিসর' (নগরপুঞ্জ ও মিসর বিজয়) গ্রন্থদ্বয়ের উর্দু ভাবানুবাদ অবলম্বনে ৬১৪ পৃষ্ঠার বিরাটকায় 'মজমুয়ে ফতুহ-শ্বাম ও ফতুহলু মেছের' পদ্যরীতিতে বিরচিত হইয়াছে। উহার আজিমদ্দীন কর্তৃক রচিত নবী প্রশস্তিটি এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর।
মহাম্মদ মোস্তফা নবী সবার সরদার।।
মে'রাজ নছিব নাহি হইল কাহার।

কেবল নছিব হৈল নবী মোস্তফার।।
খোদার পেয়ারা নবী দ্বীনের লাগিয়া।
কত কষ্ট উঠাইল হায়াতে থাকিয়া।।
অবোধ উম্মত তাঁর কিসে জ্ঞান পায়।
সতত ছিলেন তিনি এই ত চিন্তায়।।
অবোধ উম্মত কিসে আসে সুরাহায়।
ছিলেন সদাই তিনি এই ত চেষ্টায়।।
অবোধ উম্মত তাঁর কিসে আপন খোদায়।
জানে আর চিনে তারা হেদায়েত পায়।।
অবোধ উম্মত কিসে দোজখ হইতে।
নাজাত পাইবে কিসে, থাকে ধেয়ানেতে।।
অবোধ উম্মত কিসে, কোফরী ছাড়িয়া।
এসলামে দাখেল হয় খোদারে চিনিয়া।।
শেরেক-বেদাত আদি বড় বড় গোনা।
কেমনে দুনিয়া হইতে হয়ে যায় ফানা।।
কেমনে খোদার খাছ বান্দা তারা হয়।
তারিকে কোফরী টুটে শেরেকী বিলয়।।
উম্মতের ভেলা তিনি উম্মত কারণ।
উম্মতি উম্মতি বলে করিবে রোদন।।
সে নবীর পরে ভেজি হাজার সালাম।
আর তাঁর আ'ল আর আছহাবে তামাম।।"

অনেক পুথির রচয়িতা মুন্সী আবদুর রহীম (রচনাকাল ১৮৫৮—৯৩ খৃঃ) তাঁহার 'গাজী-কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি'র সূচনায় বলেন—

"প্রথমে বন্দিনু প্রভু সুচি নিরঞ্জন।
এ তিন ভুবনে যত তাহার সৃজন।।
তাহার পরম সখা নবী মোস্তফার।
লক্ষ কোটি ছালাম দরুদ পরে তার।।

সখা সঙ্গী যত তার আছে ভার্যাগণ।
নবী বংশে যত আর হইল উৎপন।।
সবাকারে কোটি কোটি সালাম আমার
সদয় রহুক প্রভু উপরে তেনার।।"

এইরূপ মিশ্র ভাষাতেই সৈয়দ নাসের আলী, হবিবল হোসেন ও আয়াজ উদ্দীন আহমদ রচনা করেন 'আলেফ লায়লা' ১৯০৭ সালে। আরবী 'আলফ্ লায়লাতিন ওয়া লায়লা' (এক সহস্র ও এক রজনী) শব্দগুলির বিকৃত বাংলা উচ্চারণ 'আলেফ লায়লা'। যে গল্প এক সহস্র ও এক রাত্রি ধরিয়া বলা হইয়াছিল তাহার সংগ্রহ এক বিরাট গ্রন্থ। গল্পটি ১৪৭৫ এবং ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ৯৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তকের সূচনায় হামদের পরে নবী প্রসঙ্গের অংশ বিশেষ—

নবী নাম কর সার যত দ্বীনদার।
আখেরাতে পুলছেরাত হবে যদি পার।।
এই বেলা ধর ভেলা নবীর তরিক।
আকবতে কেয়ামতে হইবে রফিক।।
নবী নাম গুণগান কর সর্বজন।
তারি পথে সিধা রাহে করহ গমন।।
যে নবী দাওয়াত গেল মেরাজ শরীফ।
যার পরে উতরিল কোরআন শরীফ।।
তাহার তারিফ করা সাধ্য কি বান্দার।
বাঞ্ছা রাখি হাশরেতে পদছায়া তার।।

উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে শতাধিক পুথি কাব্যকারের উল্লেখ 'পুথি পরিচিতি, পুথি সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। তাহারা কয়েকশত কাব্য রচনার দাবীদার বলিয়াও সেখানে বলা হইয়াছে। কিন্তু বিংশ শতকের পাদপ্রান্তে আসিয়া কবিগণ মিশ্র ভাষা ব্যবহার ত্যাগ করতঃ নবাব ফয়জুন্নেছার 'রূপ জালাল' এর সুমার্জিত ও সাবলীল ভাষার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবার প্রবণতা দেখাইয়াছেন। ফলে তখন হইতে মহানবীর জীবনী আধুনিক অমিত্রাক্ষর বা হোসেনী ছন্দে রচিত হইয়াছে।

পুথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পুথি-সাহিত্যে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উল্লেখিত হইয়াছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। এই পর্যায়ে প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য কবি, পুথিকার শেষ নবী (সাঃ)-এর জীবনী নিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেইগুলির অধিকাংশই আবার প্রকাশিত হয় নাই। একই কথা বলা যায় অ-নবীমূলক পুথির ব্যাপারেও। শেষ নবীর ধর্ম প্রচার, জীবন নীতি, আদেশ-উপদেশ প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক পুথি রচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক পুথিতে 'হামদ' ও 'নাত' প্রসঙ্গে হযরতের সত্য সন্ধানী মনের পরিচয় এবং দয়ালু চিত্তের রূপরেখা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। 'নাৎ-এ-রসুল' মধ্যযুগের সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া আছে এবং সেই প্রবাহ আধুনিক সাহিত্য ক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয়। লোক সাহিত্যেও এই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। 'কাসাসুল আম্বিয়া' প্রভৃতি পুথিতে অন্যান্য নবীদের সঙ্গে মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) যেমন উল্লেখিত হইয়াছেন, তেমনই স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে বিজয় কাব্য ও অন্যান্য পুথিতে। 'নবী বংশ', 'রসুল বিজয়' ইত্যাদি কাব্যে যে আঙ্গিক ও ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে তাহার সঙ্গে হিন্দু কবিদের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', 'হরিবংশ' ইত্যাদি কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শুধু ধর্মীয় প্রেরণায় এবং ফারসী কাহিনী কাব্যের অনুসরণে রচনার উপজীব্য বদলাইয়াছে মাত্র, বিষয়বস্তু নির্বাচনে মুসলিম কবিরা এই ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। ফলে 'ওফাতে রসুল', 'রসুল বিজয়', 'শবে-মেরাজ' ইত্যাদি পুথি রচিত হইয়াছে সৈয়দ সুলতান প্রমুখ পুথি সাহিত্যিকের দ্বারা। পরবর্তী কবিদের রচনায় সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্রবোধ স্পষ্ট আখরে ধরা দিয়াছে। এখানেও কবিরা ইতিহাসের যথার্থ অনুসরণ করেন নাই; ভক্তিবাদ ও আবেগকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এখানে উদ্ভট কল্পনার খেলা সমধিক। তাহাতে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক মর্যাদা প্রায়শঃ রক্ষিত হয় নাই। ফলস্বরূপ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অসামান্য জীবনের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা পাঠকদের হয় না। তবে শেখ চান্দের 'রসুল বিজয়'

পুঁথিখানি অপেক্ষাকৃত ইতিহাস-ভিত্তিক। আজ পর্যন্ত সন্ধানপ্রাপ্ত যে সকল পুঁথি মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গে রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত কাব্যগুলি প্রধান।

পুঁথির নাম	লেখক
১। রসুল বিজয়	কবি জঈন উদ্দীন
২। ওফাতে রসুল	সৈয়দ সুলতান
৩। শবে-মেরাজ	ঐ
৪। রসুল রচিত	ঐ
৫। নবী বংশ	ঐ
৬। রসুল বিজয়	ঐ
৭। জয়কুম্ রাজার লড়াই	ঐ
৮। জংগনামা	নসরুল্লাহ খাঁ
৯। নুরনামা	মীর মোহাম্মদ শফী
১০। রসুল বিজয়	শাহ বারিদ খাঁ
১১। নুরনামা	শেখ পরাণ
১২। রসুল বিজয়	শেখ চান্দ
১৩। নুরনামা	আবদুল হাকিম
১৪। রসুল-রচিত	কবি মোহাম্মদ জমি
১৫। দুল্লা মজলিস	আঃ করিম খন্দকার
১৬। নবী বংশ	ঐ
১৭। নুরনামা	ঐ
১৮। আম্বিয়া বাণী	কাজী হায়াৎ মাহমুদ
১৯। নবীনামা	ঐ
২০। রসুল বিজয়	গোলাম রছুল
২১। কাছাছোল আম্বিয়া	তাজউদ্দীন মুহাম্মদ (প্রমুখ)
২২। কাছাছোল আম্বিয়া	কাজী শফিউদ্দীন (প্রকাশক)
২৩। কাছাছোল আম্বিয়া	মুন্সী জনাব আলী

পুথির নাম	লেখক
২৪। কাছাছুল আম্বিয়া	মুন্সী আমীর
২৫। খোলাছাতুল আম্বিয়া	এলাহী বক্স দেওয়ান
২৬। মৌলুদের পুথি	মুন্সী জনাব আলী
২৭। খেলাফত নামা	মুন্সী তাজউদ্দীন
২৮। মদীনার গৌরব	মীর মশাররফ হোসেন
২৯। মোসলেমের বীরত্ব	ঐ
৩০। খায়ের বরকত (নবীজীর জন্ম বৃত্তান্ত)	আবদুল গফুর
৩১। হালাতুনবী	মুন্সী সাদেক আলী
৩২। নূরনামা হুলিয়া নামা	মুন্সী খাতের মোহাম্মদ
৩৩। খোলাসাতুল আম্বিয়া	ঐ
৩৪। নূরনামা	আবদুল করিম
৩৫। তরিকায়ে মোস্তফা	মুন্সী ফসিহুদ্দীন
৩৬। নূরনামা	দেবান আলী
৩৭। জঙ্গে খায়বর	দোস্ত মোঃ চৌধুরী
৩৮। তাওয়ারীখে মোহাম্মদী	মোঃ মোহাম্মদ ছায়ীদ
৩৯। জঙ্গে খয়বর	মুন্সী জনাব আলী
৪০। রসুলের মে'রাজ	কবি ফৈজুদ্দীন
৪১। নাজাতে কাওসার	সাইয়িদ আঃ কাদির
৪২। মাযারে ফিরদাওস	ঐ
৪৩। মেহরাজ নামা	শাহ জোবেদ আলী
৪৪। কেরামতে আহাম্মদ	মওলবী আঃ সোবহান
৪৫। জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে আলী	মোঃ আজহার আলী
৪৬। ছহিবড় রহমতে আলম	ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা

এবং জঙ্গে বদর, জঙ্গে ওহুদ প্রভৃতি।

উপরোক্ত কাব্যসমূহের মধ্যে প্রধানগুলির উপর একটি সাধারণ সমীক্ষা বা পর্যালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আম্বিয়াবাণী :—১১৬৫ বাংলা মোতাবেক ১৭৫৮ ইংরেজী সালে কাজী হায়াত মাহমুদ এই পুঁথি রচনা করেন। তিনি মোগল আমলের শেষ এবং শক্তিশালী কবি ছিলেন। তিনি রংপুরের সুলঙ্গা বাগদ্বার পরগণার অধীন ঝাড়বিশাল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'নবী নামা' নামে একখানা পুঁথিও রচনা করেন। কবির অন্যতম প্রধান পুঁথি 'আম্বিয়াবাণী' তাঁহার শেষ সাহিত্য কর্ম। ইহা নবী কাহিনীমূলক গ্রন্থ। ইহাতে প্রধান প্রধান পয়গম্বরদের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং অবশেষে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর প্রসঙ্গ আসিয়াছে। আবু জেহেলের জঙ্গ পর্যন্ত আসিয়া কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে নূরে মোহাম্মদী সৃষ্টি, তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি, অতঃপর হযরত আদম (আঃ)-এর কপালে সেই নূর স্থাপন এবং তাহা হইতে বংশ পরম্পরায় হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল আলায়হিস্সালাম-এর মধ্যস্থতায় সর্বশেষ আবদুল্লার কপালে এবং তথা হইতে বিবি আমেনার গর্ভে গমন এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) রূপে পয়দা হওয়ার বিবরণ রহিয়াছে। কিভাবে এই ধারাবাহিকতা চলিয়াছিল, তাহা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর জন্ম বর্ণনা হইতে বিশদভাবে বুঝা যায়। যেমন ঃ

ছারা যদি হাজিরাকে দিল সেই রাতি।
খলীল তাহার সঙ্গে পুঞ্জিল সুরাতি।
মুহাম্মদী নূর গেল তাহার উদরে।
খলীল শ্রীহীন হৈল নিজ কলেবরে।।
হাজিরা রঙ্গরূপ জলিতে লাগিল।
বিহানে দেখিয়া ছারা স্বামীকে পুছিল।।

বলা বাহুল্য নূরে মোহাম্মদী সম্বন্ধীয় কাহিনীটি কুরআন, সহীহ হাদীস বা প্রাথমিক যুগের আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই কাহিনী গ্রীক দার্শনিকদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত বর্ণনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পরবর্তী সুফীগণ ওয়াহদাতুল ওজুদের সমর্থনে উদ্ভাবন করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস)।

কবি হায়াত মাহমুদের পুঁথিটিতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

ও বাণী বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। ইহা হইতে নবীজীর বন্দনার কিছুটা এখানে তুলিয়া দিতেছি ঃ

"বন্দ নবী মুহাম্মদ যে হইল আহাম্মদ,
আহাদ হইতে উপাদান।
এক নূর দুই ঠাঁই, হইল পরম সাঁই,
নূর মুহম্মদ সেহি জান।"

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বেহেস্ত দর্শনের বর্ণনা আংশিক উদ্ধৃত হইল। লেখকের সহজ সরল কবিত্ব রসধারা ইহাতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়াছে ঃ—

"বহে নদী মিষ্ট ধার, সুবাসিত জল তার,
সেই পানি যায় নিরন্তর।
ভেস্তের অপূর্ব সাজ, দেখিয়া অপূর্ব কাজ,
আনন্দে পুরিল পয়গম্বর।
বলে হেন ভেস্তপুরী, যে পাইব পুণ্য করি,
ততোধিক ভাগ্য আছে কার।
জিবরাইল তাহাকে কয়, শুনো নবী মহাশয়
এ পাইব উম্মত তোমার।"

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের বর্ণনা কবির ভাষায় ঃ—

"ছাইদিয়া মুহম্মদ তুরিত গমনে
পর্বত-কাননে যায় আবুবক্র সনে।
এক সুরঙ্গের দ্বারে প্রবেশিল যাইয়া
লুকাইতে চাহে নবী তাহাতে সামাইয়া।
ছিদ্দিক আকবর বলে আগে আমি যাই
কি জানি সুরঙ্গে থাকে কোন বা বালাই।"

'আম্বিয়াবাণী' পুঁথিটিতে চিরাচরিত প্রথানুসারে আল্লাহ-রসুল ও গুরুর বন্দনা শুরু করিয়া কবি হযরতের মে'রাজের বর্ণনা, বেহেশত, দোযখ,

আল্লার দিদার লাভ ইত্যাদি বিবরণও তুলিয়া ধরিয়াছেন। কবি নিজের বার্ধক্যবশতঃ হযরতের জীবনের সব ঘটনা আলোচনা করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখিত। তিনি বলেন,

নবীর মহিমা গুণ অশেষ অপার।
পদবন্দে কত আমি করিব প্রচার।।
শেষ ইতি যুদ্ধখন্ড বিস্তর কাহিনী।
কাফির মারিয়া কৈল দীন মুসলমানী।।
একে শেষ কাল তাতে জঞ্জাল অপার।
কহিতে না পারি আমি এতাধিক আর।।

পুথিটি "আধা ধর্মীয়, আধা জীবনী" মূলক কাব্য। কবির কাব্য কৌশল ধরা পড়িয়াছে তাঁহার শব্দচয়ন, চিত্র, ভাব ও ভাষার মাধ্যমে। অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, শ্লেষ ইত্যাদির প্রয়োগে কবি নিপুণ শিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন। যেমন—

"কলিতে কলেমা নবী করিল প্রচার।
করিম রহিম দিল কোরান তাহার।"

মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য সহকারে রচিত এই পুথিটি ঐতিহ্য-নির্ভর হইলেও ইহাতে দেশীয় লোকজ ধ্যান-ধারণা ও হিন্দুয়ানী আচার এবং এর সঙ্গে নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কার মিলিয়া কবির বর্ণনায় অলৌকিকতার সমন্বয় ঘটিয়াছে।

কাছাছোল আম্বিয়া বা খোলাসাতুল আম্বিয়া ঃ—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বাংলাভাষী অঞ্চলে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনী প্রধাণতঃ প্রচারিত হইয়াছে 'কাছাছোল আম্বিয়া' নামক নবী কাহিনীমূলক বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে। আরবী ফারসীতে রচিত 'কাছাছোল আম্বিয়া' বাংলায় অনূদিত হইয়াছে যৌথভাবে। এইসব লেখকদের ভাষার গঠন শিথিল ও কল্পনার ধারা গতানুগতিক। তবে গ্রাম বাংলার মুসলিম পরিবারে ইহা বিশেষ সমাদরের সঙ্গে পঠিত হয় এবং ইহার পাঠক সংখ্যাও নেহায়েত কম নহে।

নবীদের কাহিনী লইয়া সর্বপ্রথম আবু ইসহাক আহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আস-সালাবী (মৃত ৪২৭ হিঃ বা ১০৩৫ খৃঃ) "আরাইসুল মাজালিস ফী কিছাছিল আম্বিয়া" নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত আল কিষাই একখানি গ্রন্থ ও সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আত্‌তুসতারী (মৃতঃ আনুঃ ৮৯৬ খৃঃ) কর্তৃক আর একখানি গ্রন্থ এবং 'খোলাসাতুল আম্বিয়া' নামে চতুর্থ আর একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। সা'লাবীর গ্রন্থখানি আবদুল ওয়াহিদ ইবনে মুহাম্মদ আল মুফতী কর্তৃক ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। ইহা ছাড়া ফারসী ভাষায় মৌলিকভাবেও কয়েকখানি নবী কাহিনীমূলক গ্রন্থ রচিত হয়। ফারসী হইতে গোলাম নবী ইবনে ইনায়েতুল্লাহ উর্দু ভাষয় ১২৬৩ হিজরীতে ইহার অনুবাদ করিয়া ১২৭৩ হিজরীতে কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় আরবী গ্রন্থ অবলম্বনে সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন মহাকবি সৈয়দ সুলতান এবং অতঃপর কবি হায়াৎ মাহমুদ। কলিকাতার পুথি প্রকাশক কাজী শফীউদ্দীনের অনুরোধে হুগলী জেলার মুন্সী রেজাউল্লাহ 'কাছাছোল আম্বিয়া' গ্রন্থ অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথম হইতে হযরত নূহ (আঃ)-এর বৃত্তান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিবার পর ইন্তিকাল করেন। অতঃপর মুন্সী আমিরউদ্দীন বাকী অংশের অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালিবের সহিত সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রা পর্যন্ত অনুবাদ করেন। তারপর তিনিও মৃত্যুবরণ করিলে শেষাংশ খেলাফত-নামা ও শাফায়াত নামা সহ মুন্সী আশরাফ আলী অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থ বাংলা ১২৬৮ সালে সমাপ্ত হয়। ইহা নবী কাহিনী সম্পর্কে বাংলার তৃতীয় গ্রন্থ।

'কাছাছোল আম্বিয়া' বা নবী কাহিনীর এই গ্রন্থখানি ডিমাই ৪ পেজী আকারের ৫৬৮ পৃষ্ঠার একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে আদি মানব হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত ৩৮ জন নবী ও রসূলের এবং হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রাঃ)—এই চারি খলিফার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

উপরোক্ত তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত বাংলা ভাষায় আরও ছয়খানি কাছাছোল আম্বিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা :—১। মুন্সী তাজউদ্দীন মুহাম্মদ ও মুন্সী আয়েজুদ্দীন কর্তৃক রচিত ও আফাজুদ্দীন আহাম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত ২ খন্ডে ৫০ বালামে ডিমাই ৪ পেজী আকারের ৯২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত চারি ইয়ারী কাছাছোল আম্বিয়া। ২। মুন্সী খাতের মোহাম্মদ (১৮৩৯—৯১ খৃঃ) কৃত খোলাসাতুল আম্বিয়া। ৩। মুন্সী তাজউদ্দীন মুহাম্মদ ও মুন্সী খাতের মুহাম্মদ কৃত ১২৭৩ সালে সমাপ্ত কাছাছোল আম্বিয়া। ৪। মুন্সী জনাব আলী কৃত কাছাছোল আম্বিয়া। ৫। ১৩০২ সালে কলিকাতার মুন্সী রহমতুল্লাহ কৃত কাছাছোল আম্বিয়া। ৬। মুন্সী আবদুল ওহাব রচিত ও মৌলবী মুহাম্মদ আসগর হুমায়ুন কর্তৃক ১২৯৭ সালে শিবাদহ আহাম্মদী প্রেসে মুদ্রিত 'কাছাছোল আম্বিয়া'। শেষোক্ত দুইখানি ব্যতীত অপর প্রায় সকল গ্রন্থেই ৩৮ জন নবী ও রসুলের বৃত্তান্ত রহিয়াছে এবং শেষ নবীর বর্ণনাও স্থান লাভ করিয়াছে।

মুন্সী খাতের মুহাম্মদ "সহি বড় মিরাজনামা" ও "নুরনামা-হুলিয়া নামা" নামে অন্য দুইটি পুঁথিও রচনা করেন। তবে তিনি তাজউদ্দীনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ১২৭৩ সালে ষোল খন্ডে 'খোলাসাতুল আম্বিয়া' ফারসী হইতে অনুবাদ করেন। প্রথম খন্ডের প্রারম্ভে রসুল প্রশস্তি নিম্নরূপ :—

মহাম্মদ মোস্তফা নবী আখেরী দেওয়ান।
যাঁহার কারণে হৈল লওহ লা-মাকান।
যাঁহার কারণে হৈল জমীন আসমান।
যাঁহার কারণে হৈল এ দোন জাহান।।
যাঁহার নুরেতে পয়দা চৌদ্দ ভুবন।
যাঁহার নুরেতে হৈল দুনিয়া রৌশন।।
দরুদ সালাম যে এমন নবী পরে।
যাঁহার নুরে তরিব হাশরে।।
তাঁহার আওলাদ আর আছহাব যতেক।
সবার জনাবে মোর ছালাম অনেক।।
—(তাজউদ্দীন রচিত অংশ হইতে)

মহানবীর জন্ম তথা নূরে মোহাম্মদী সম্বন্ধীয় একটি উদ্ধৃতি ঃ—

"পুছিলেন ইয়ার সব কহ আলমপানা।
কোন্ চিজ আগে পয়দা করিল রব্বানা।।
কহিলেন রসূলুল্লাহ সবার হুজুর।
আগে আল্লাহ পয়দা কৈল আপনার নূর।।
গুপ্তরূপে একা যবে ছিল পরওয়ার।
সেই নূর বিনে ছিল সব নৈরাকার।।
আপন কুদরত আগে করিতে জাহের।
সে নূরে আমার পয়দা কৈল ফের।।
আমার নূরেতে পয়দা তামাম জাহান।
আরশ কুরসি আদি লওহ লা-মাকান।।"

'খোলাসাতুল আম্বিয়া'র অনুবাদ কাছাছুল আম্বিয়া গ্রন্থটি ১৩৩৬ সাল পর্যন্ত অষ্টাদশ সংস্করণে মুদ্রিত হয়। ইহাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কিত বিষয়গুলি এইরূপ ঃ—

- মোহাম্মদী নূরের পয়দায়েশের বয়ান,
- আজাজিল পয়দায়েশের বয়ান,
- নূরে মোহাম্মদী বংশ পরম্পরায় বিবি আমেনার নিকট আসে,
- হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম;
- বিবি হালিমা কর্তৃক তাঁহাকে প্রতিপালন ও প্রথমবার সীনা চাক,
- হজরতের মাতৃ বিয়োগ,
- পিতৃব্যের সহিত সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রা,
- বাহিরা রাহেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী,
- হজরতের দ্বিতীয়বার সীনা চাক,
- হজরত খাদিজার সহিত হযরতের বিবাহ,
- কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ,
- হজরতের বিবিদের নাম ও অবস্থা এবং হজরতের নেক খাসলতের বয়ান,
- হজরতের আওলাদগণের বয়ান,

- o হজরতের তৃতীয়বার সীনা চাক ও ওহী আগমন।
- o হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ,
- o হজরতের মোজেজা ও বুজগীর বয়ান,
- o হজরতের মদীনায় হিজরত,
- o বদরে কোবরার লড়াই,
- o আয়েশা বিবির প্রতি অপবাদ,
- o জংগে ওহোদের বয়ান,
- o বদরে সুগরার লড়াই,
- o খয়বরের লড়াই,
- o বনি কুরাইযার লড়াই,
- o তবুকের লড়াই,
- o তবুকের বাদশাজাদির বিবরণ ও হোস্বাম জঙ্গি ও আলকাম শাহজাদার সহিত হজরত আলীর লড়াই,
- o হোদাইবিয়ার ছোলেহ,
- o ফতেহ মক্কা,
- o হোনাইনের লড়াই,
- o হাজ্জাতুল বেদা,
- o হজরতের ওফাত,

উপরের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্রটি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এমন বহু ঘটনার কথা আছে যাহার আদৌ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তবুকের শাহজাদীর বিবরণ সংক্রান্ত অধ্যায়টি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আবার অনেক ঘটনার ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। অনেক কিংবদন্তীমূলক ঘটনাও ইহাতে রহিয়াছে। অথচ জঙ্গে খন্দকের ন্যায় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ইহাতে নাই।

পূর্বে উল্লেখিত 'কাছাছোল আম্বিয়া' নামক পুঁথিগুলির আরও তিনটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। যেমন (ক) মুন্সী আমির কর্তৃক অনুদিত 'কেছাছুল আম্বিয়া'। ইহা ফারসী হইতে তরজমা করা হইয়াছে। ২ খণ্ডে সমাপ্ত পুস্তকটি ১৮৬৮ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। (খ) ফরিদপুরের মালঙ্গার কবি এলাহি বক্স দেওয়ানের 'খোলাছাতুল আম্বিয়া' এবং (গ) সর্ববৃহৎ "চার ইয়ারী কাছাছোল আম্বিয়া" (১৯০২)। শেষোক্ত গ্রন্থটির উপর একটি সমালোচনা ১৩৬৬ বাংলার অগ্রাহায়ণ সংখ্যা 'মাসিক মাহেনও' 'এ প্রকাশিত হয়। ইহা নিম্নরূপ :—

"আরবী-ফারসী মিশ্রিত ঘরোয়া বাংলা জবানে লিখিত "চারইয়ারী কাছাছল আম্বিয়া" নামক পুঁথিখানা পঞ্চম জেলদ (খণ্ড) তেত্রিশ বালাম (অধ্যায়)

এবং ৯১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পুঁথির রচয়িতা তিনজন (১) মোহাম্মদ তাজ উদ্দীন (২) খাতের মোহাম্মদ এবং (৩) আবদুল ওহাব। (পুঁথির নাম দেখিয়া অনুমিত হয় যে চার বন্ধুতে মিলিয়া পুঁথিখানি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনজনের বেশী নাম রচয়িতার ভূমিকায় নাই।)

"মোঃ তাজউদ্দীন পুঁথির প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় (৯১ পৃঃ) পর্যন্ত রচনা করেন। খাতের মোহাম্মদ রচনা করেন ১ম খণ্ডের ৫ম অধ্যায় থেকে চতুর্থ খণ্ড ও ৩২ অধ্যায় পর্যন্ত (৮০৪ পৃঃ)। আর অবশিষ্ট ৫ম খণ্ড (৮০৫—৯১৬ পৃঃ) রচনা করেন আবদুল ওহাব। পুঁথিখানিতে অনেক নবীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ৫৯৮ হইতে ৮০৪ পৃষ্ঠায় মহানবী (দঃ) এর ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অপূর্ব জীবন-মাহাত্ম্য ও চরিত্র-মাধুর্য বর্ণিত হইয়াছে। 'মোহাম্মদী নূর' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।"

পহেলা আপনার নূরে আপে করতার
পয়দা করিল নূর নবী মোস্তফার।।
সে নবীর নূর হতে ফেরেস্তা আলম।
আরস কোরসী আদি লওহ কলম।।
বেহেস্ত দোজখ আর জেন্ন এনছানেরে।
পয়দা করিল যত মখলুকাত ছারে।।

'হজরত রসূলে আকরাম (দঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে রূহু কবজ কালে আজরাইল (আঃ) এর সঙ্গে তাঁহার কথোপকথনের বয়ান :—

আজরাঈল শুনে এয়ছা হজরতের বাত।
মোবারক ছিনা 'পরে মারিলেন হাত।।
আহা আহা বলে নবি সেই সময়েতে।
মালেকল-মউতেরে লাগিল কহিতে।।
শুন আজরাইল কহি তোমার খাতিরে।
দরদ পওছিল এছা আমার উপরে।।
মালুম হইল মুঝে এমনি প্রকার।
ছাতির উপরে যেন পড়িল পাহাড়।।
কহ মেরা উম্মতের মউত সময়।

এমনি কেলেস কি হবে সবাকার ।।
আজরাইল কহে, শোন নবি নামদার ।
তবু আমি মোবারক রূহকে তোমার ।।
লিতেছি কবজ করে আছানের সাথে ।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, দয়াল নবী মৃত্যুর কঠিন সময়েও আপনার স্নেহের উম্মতের কথা ভুলেন নাই। কথিত আছে, সকল নবীই নিজকে নিয়া পরকালে ব্যস্ত থাকিবেন। আর আমাদের প্রিয় রসূল তথায় তদীয় অনুসারিগণের জন্য সুপারিশের হস্ত প্রসারিত করিবেন। এখানেই প্রাচীন পুঁথি কাব্যের আবেদন পাঠক সাধারণের মর্মমূলে আঘাত হানে। এই জন্যই নবী কাহিনীমূলক পুঁথি সাহিত্যের আদর ও মূল্য মুসলিম জন-সমষ্টির মধ্যে অত্যধিক। উহা যেন আধুনিক সাহিত্যিকদের মন্তব্যের কোনই তোয়াক্কা রাখে না।

নূরনামা ঃ 'নূরনামা' নামে অনেক কবিই পুঁথি রচনা করেন। মীর মুহাম্মদ শফী (১৫৫০-১৬২০ খৃঃ), আবদুল হাকিম (১৬২০—৯০ খৃঃ) শেখ পরাণ, দেবান আলী, আবদুল করিম খন্দকার (আরাকানী) প্রমুখ কবি উক্তরূপ পুঁথি রচনা করেন। সকল পুঁথিতেই নূর হইতে কিভাবে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সৃষ্টি হইলেন তাহা মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে। আবদুল হাকিম সাহেবের 'নূর নামা'র সামান্য আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কবি আবদুল হাকিম বিরচিত ***'নুর নামা'*** গ্রন্থখানি সাবেক বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পুস্তকাকারে অধ্যাপক আলী আহাম্মদ (মৃঃ ১৯৮৭ খৃঃ) এর সম্পাদনায় প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নূর সৃষ্টির বর্ণনা রহিয়াছে। এই নূর সৃষ্টির বিবরণ পাঠ করিলে পুণ্য লাভ হয়—কবি তাহাও গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমানী ধর্মীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করা উচিৎ কিনা, এই বিষয়ে এক সময়ে বাদানুবাদ চলিয়াছিল। কবি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করেন ও গ্রন্থ রচনা করেন। এই যুক্তিগুলি গ্রন্থটিকে সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে। চারটি কলমী পুঁথির সাহায্যে 'নূরনামা' গ্রন্থটি সম্পাদিত।

(এই পুঁথিগুলি কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলাতে প্রাপ্ত)। রসুলগণের উপর কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহাদের নিজের ভাষায়। কবি আবদুল হাকিম 'নুর নামা'য় বলেন :—

"আরব সহরে প্রভু মোহাম্মদ স্থান।
নিযুজে আরবী বাক্য মুছাফ ফোরকান॥
উরিয়ান সহরেত বাক্য উরিয়ান।
পাঠাএ তোরিত প্রভু মুছা নবীস্থান॥
ইউনান সহরেত ইউনান ভারতী।
নিযুজে জব্বুর প্রভু দাউদের প্রতি।
ছুরিয়ান সহরেত বাক্য ছুরিয়ান।
পাঠাএ ইঞ্জিল প্রভু ইছা নবীস্থান।।"

সুতরাং বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ রচনার দোষ থাকিতে পারে না। কারণ আল্লাহ সকল ভাষাই বোঝেন।

কাব্য পাঠের সুবিধার জন্য গ্রন্থটি নিম্নোক্ত অধ্যায়সমূহে বিভক্ত।—

(ক) আল্লাহর স্তুতি ও রসুলের মাহাত্ম্য বর্ণনা।
(খ) বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ রচনার কারণ।
(গ) নুরনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সৃষ্টি।
(ঘ) প্রভু কর্তৃক দশটি সমুদ্র সৃষ্টি ও তথায় নুর নবীর সাধনা।
(ঙ) নুরে মুহাম্মদী হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি।
(চ) আব, আতশ, খাক ও বাদের সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহুর কথোপকথন।
(ছ) কলম প্রসঙ্গ। (জ) নুরনামা গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা।
(ঝ) নুরনামা গ্রন্থের প্রতি ইমাম গাজ্জালী ও সুলতান মুহাম্মদের শ্রদ্ধা।
(ঞ) হজরত মুহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির রহস্য।
(ত) নুরনামা গ্রন্থ পাঠে পুণ্য অর্জন।।

"হজরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির রহস্য" অধ্যায় হইতে একটি উদ্ধৃতি দিয়া আলোচ্য প্রসঙ্গের ইতি টানিতেছি। যেমন :—

"লজ্জা হন্তে মোহাম্মদ নয়ন নির্মিত।
উপজিতে লজ্জা নরলোকের বিদিত।।
স্বর্গের আম্বর দিয়া প্রভু নিরঞ্জন।
করিলেক মোহাম্মদ নাসিকা সৃজন।।
সৃজিলেক মোহাম্মদের এ দুই শ্রবণ।
উপজিতে মনে ত্রাস শুনিয়া বচন।। ...
সৃজিলা নবীর জিহবা প্রভু করতার।
কহিবারে অবিরত জিকির আল্লার।।
সৃজিলা নবীর দিল প্রভু নিরঞ্জন।
ভক্ত মনে প্রভু সেবা করিতে কারণ।।
ভাল মন্দ মন মধ্যে বুঝিয়া সমর্ম।
ভাল বিনে না করিতে জে কর্ম বি ধর্ম।।
আপনার বলবীর্য দিয়া নিরঞ্জন।।
নবীর যুগল বাহু করিলা সৃজন।। ...
বেহেস্তের মেস্ক হন্তে জানহ বচন।
নবীর অঙ্গের মাংস হইল সৃজন।
স্বর্গ মধু হন্তে জান স্বরূপ বচন
নবীর হলকুম গঠন হইল সৃজন।।"

এমনভাবে স্বর্গের ইয়াকুত হইতে নবীর বুক সৃষ্ট, ছবর দ্বারা উদর সৃষ্ট, বেহেস্তের তৃণ দ্বারা নবীর লোমরাশি ও কর্ফুর হইতে অস্থিসমূহ সৃষ্ট। আর

"মোহাম্মদ রসূলের যুগল চরণ
সৃজন হইল প্রভু সেবিতে কারণ।"

সত্যিকারের নবীপ্রেমিক হইয়াই কবি 'নুরনামা' রচনা করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শেখ পরাণের **'নুর নামা'** সৃষ্টি পত্তন সম্বন্ধীয়। ইহাতে হিন্দু-বৌদ্ধ ও ইসলামী মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ইহাতে 'বিছায়াল কুতুবা' নামক পঞ্চকর্মের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একটি উৎকলন নিম্নোক্ত হইল।

কী উফাএ করিমু নবি কহত আমায়।
হেতু বুদ্ধি কহ পঞ্চকর্ম করিবার।।
আলির এথেক কথা রচুলে শুনিয়া।
একে একে কহে নবী নামাজে বসিয়া।।
রচুলে বুলিল আলি সুন তত্ত্ব সার।
'বিছায়াল কুতুবা' পঞ্চকর্ম করিবার।।
ছুরত ফাতেহা যদি পর তিনবার।
জেহেন করিয়া দান একাদশ বার।। ইত্যাদি

গ্রন্থের ভাষা-প্রয়োগ নিতান্ত সেকেলে ধরণের।

দেবান আলী রচিত আর একখানি '*নূর নামা*' পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাও শেখ পরাণের মতাদর্শে বিরচিত। কবি হিন্দু-বৌদ্ধ মত আল্লা-রসুলের নামের আবরণে মুসলমানী করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। পুঁথি শেষ করিয়া লিপিকার আবার লিখিয়াছেন ঃ—

"দিজ দেবন আলী এ গুনিন যে ভাল।
নিরঞ্জন হোতে নুর মোহাম্মদ হইল।।
তার পরে সৃষ্টি পত্তন কোন মতে হএ।
কোন জন চারিদিকে ভেদ জে কর এ।।"

নাগরী পুথি কাব্য ঃ সিলেটি নাগরী শিখতে মাত্র আড়াই দিন লাগে এবং তাহার উচ্চারণ বাংলারই মত। সে অক্ষর সিলেটের আঞ্চলিক উচ্চারণকেও যথাযথ বজায় রাখে। এই নাগরী হরফে বহু পুঁথি সাধক কবিগণ কর্তৃক লিখিত এবং সিলেট ও কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এইসব পুঁথিতেও প্রসঙ্গক্রমে রসুল প্রশস্তি উল্লেখিত হইয়াছে। এইসব সাধক মরমী পুঁথিকারদের অসংখ্য নামের মধ্যে উল্লেখ্য হইলেন—মহাকবি সৈয়দ সুলতানের পীর শাহ হোসেন আলম, হযরত ইলিয়াস কুদ্দুস, কুতুবুল আওলিয়া, সৈয়দ মুসা, শেখ চান্দ, সৈয়দ শাহনুর, আবদুল ওহাব চৌধুরী, মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ, ওরফে শীতলাং শাহ, মৌলানা ইব্রাহীম তশনা, মনির উদ্দীন ওরফে দৈখোর, দেওয়ান হাসান রাজা, সহিফা বানু, ছাবাল আকবর

আলী, সৈয়দ নওশের আলী, কালাশাহ, মুন্সী ইরফান আলী, মুন্সী মুশ্বীইদ আলী, জহুরুল হোসেন, উম্মর আলী, কিসমত আলী চিশতী, সৈয়দ আবদুল লতিফ চিশতি, আয়াত শাহ, পীর মুন্সী আছদ আলী, আবদুল মজিদ ওরফে খতিশাহ. শেখ ভানু, হাজী মোহাম্মদ ইয়াছীন, দীনহীন ওরফে জহির উদ্দীন, পীর কলন্দর ফকির, কবি নজির, অধম খলিল, বুরহান উল্লাহ, মুন্সী রহমতুল্লাহ, ওয়াজির আলী, সৈয়দ নিয়ামত আলী, ছালমা বানু, মুন্সী মবিন উদ্দীন, রাধারমন দত্ত প্রমুখ। এইসব সাধকদের অনেক হস্তলিখিত পুঁথি নাগরীতে লিখিত যাহার মধ্যে মহানবীর শরীয়ত প্রসঙ্গও স্থান পাইয়াছে। যেমন সৈয়দ নওশের আলী বলেন ঃ

"তোমরা শরিয়ত ছাড়িও না।
শরিয়ত ছাড়া মারিফত হইতে পারে না।।
আউয়ালে শরীয়ত জানো ঘরের ঠিকানা।
আন্দরতে গিয়া দেখ মারিফতে দেনা।।'

সিলেটি নাগরী হরফের কয়েকটি পুঁথির আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

'হালাতুন্নবী'—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনৈতিহাসিক কিংবদন্তী মিশ্রিত জীবন-চরিত। রচনা করেন সিলেটের মরহুম মুন্সী সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২ খৃঃ)। তাঁহার পূর্ব নাম গৌরকিশোর সেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া সাদেক আলী নাম ধারণ করেন। তিনি সিলেটি নাগরী অক্ষরে 'রদ্দেকুফর', 'হাসর মিছিল', 'মহব্বত নামা' ও 'হালাতুন্নবী' গ্রন্থ রচনা করেন। 'হালাতুন্নবী'-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮১।

কথিত আছে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের প্রচারকার্য চালাইবার জন্য 'হালাতুন্নবী' গ্রন্থ সহজ সরল নাগরী ভাষায় রচনা করেন। এই ভাষা ভারতীয় নাগরী হইতে সহজ পাঠ্য ও কম হরফ বিশিষ্ট। সৈয়দ মর্তুজা আলী (১৯০৩-৮১ খৃঃ) বলেন, "হালাতুন্নবী" নাগরী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় পুস্তক। ইহাতে সৃষ্টি-তত্ত্বের বর্ণনা ও হযরত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর জীবনী আছে।"—(সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৮)।

'হাজারসওয়াল' পুঁথিখানিতে আল্লাহ ও রসুলের কথাবার্তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ :

"নবী বুলে উম্মত নি পাইবা জন্নত।
আল্লা বুলে যে করিবা আল্লার এবাদত।।
নবী বুলে উম্মতে কি খাইবা আমার।
আল্লা বুলে আমি দিমু, তুমি কি তাহার।।
নবী বুলে উম্মত হইবা গোনাগার।
আল্লা বুলে তওবা কৈলে খেমা দিমু তার।।
কতবা লেখিমু আমি পুঁথি বাড়ি যায়।
নব্বই হাজার বাতচিত রসুল-আল্লায়।।"

মহানবী মে'রাজ ভ্রমনে গেলে আল্লাহর সহিত নব্বই হাজার কথা হইয়াছিল এই কথা অন্যান্য পুঁথিতেও ব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থে মে'রাজের ধারা বিবরণীও ছন্দাকারে বর্ণিত হইয়াছে। মহানবীর শেষ নছিহত সম্পর্কে আছে :

"বড় নছিহত করে রসুল আল্লার।
এবাদতে হামেসা চালাকী থাকিবার।।
ছবর শুকুর করি থাকিবা সদায়।
এবাদত যত অত খুশী হইবায়।।
বেহেস্ত দোজখ বিনে জাগা নাই আর।
মুমিনে বেহেস্তে হইব, দোজখে কুফফার।
দীনের বেপার কর দুনিয়াতে ভাই।
এখানে হারিয়া গেলে শেষে পাবে নাই।।"

শেষ নবী (সাঃ)-এর ওফাত ও দাফন সম্পর্কে—

"সোমবার দিনে নবীর হইল উফাত।
দফন করিলা তানে বুধবার রাত।"

দুনিয়ার অস্থায়িত্ব, নবীর আদর্শে অবিচল থাকা প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থে বর্ণনা রহিয়াছে।

সাদেক আলীর 'হালাতুন্নবী' পরে বাংলা ভাষায় অক্ষরান্তরিত করেন মোহাম্মদ ইউসুফ। এই বাংলা সংস্করণ পরবর্তীকালে সিলেট হইতে জনৈক আপ্তাব মিয়া কর্তৃক মুদ্রিত হয় ১৩৭৯ বাংলা সনে। ইহা পুথির মতই ডান হইতে বাঁ দিকে লেখা দোভাষী কাব্য। প্রকাশক আপ্তাব মিয়া নিজেকে লেখক বলিয়া প্রচার করিলেও গ্রন্থে স্পষ্টভাবে সাদেক-এর নাম পাওয়া যায়। বনিতায় কবি বলিয়াছেন :

অধমে ও ছাদেক কয় কত কথা মনে লয়
শুনিয়া বেহেস্তের হাল।

এই ভনিতা হইতে স্থির সিদ্ধান্ত করা চলে যে, সাদেক আলীই 'হালাতুন্নবী' -এর লেখক।

সিলেট শহরের মুন্সী বুরহান উল্লা ওরফে চেরাগ আলী উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ***'হালাতুন্নূর*** নামক একখানা বৃহৎ পুথি রচনা করেন। মহানবীর উপর রচিত এই কাব্যটি ১৮৯৬ সালে শরাফতউল্লা ও করিম বক্স প্রকাশ করেন। ইহাতে আল্লার নূরের বর্ণনা ও মারফাতি কথা আছে। মুন্সী জাফর আলী রচনা করেন ***'অছিয়তুন্নবী'*** গ্রন্থটি। ত্রিপুরার হাজী মোঃ ইল্লাছিন (১৮৩৬—১৯২১ খৃঃ) ***'মাজেজাতুন্নবী'*** শীর্ষক একখানা পুথি রচনা করেন। ইহা শেষনবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে রচিত একটি বৃহৎ পুথি। করিমগঞ্জের মাজহারুল হক ***'তরিকুন্নবী'*** পুথিটি রচনা করেন। ইহা হযরত রসুলের আচার ব্যবহার বিষয়ক শামায়েল জাতীয় গ্রন্থ। ইহাতে মুসলমান সমাজের শিক্ষনীয় নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাহ মোঃ ইয়াসীন মারফতি বিষয়ে রচিত ১০০টি গান সম্বলিত 'আশেকে খোদা ও হুবের রসুল' নামক পুথি রচনা করেন। জমির উদ্দীনের নাগরী পুথি ***'ওয়াজিয়াতুন্নবী*** ১৮৭১ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ***'আহকামুন্নবী'*** ও ***'শফাতুন্নবী'*** নামে দুইটি পুথি এই ভাষায় রচিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে পরহেজগার লোকের আখেরে নাজাতের বিষয়ে বর্ণনা রহিয়াছে।—(প্রবন্ধ বিচিত্রা দ্রষ্টব্য)।

'জংগনামা'—'জংগনামা' শীর্ষক পুথি রচনা করেন অনেক সাধক

পুঁথিয়াল। যেমন জনাব আলী, হায়াত মাহমুদ, নসরুল্লা খাঁ, গরীবুল্লাহ, মোঃ ইয়াকুব, মোহাম্মদ খান প্রমুখ কবিগণ। 'জংগনামা' শ্রেণীর পুঁথিগুলি ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে যুদ্ধসংক্রান্ত গ্রন্থ। নায়ক যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার বিবরণ রহিয়াছে এই সমস্ত পুঁথিতে। নসরুল্লাহ খাঁ (১৫৬০-১৬২৫ খৃঃ)-এর 'জংগনামা' ব্যতীত অন্যান্যদের পুঁথি বিশেষতঃ কারবালার বিয়োগান্ত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তবুও এইসব পুঁথিতে প্রসঙ্গক্রমে রসুলের বন্দনা বা প্রশস্তি আসিয়াছে। নসরুল্লাহ 'খাঁর জংগনামা' বীরকেশরী হযরত আলীর সহযোগে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দিগ্বিজয়ের কাহিনী। ইহাতে সর্বত্রই শেষনবী(সাঃ)-এর বিজয় এবং কাফিরগণের পরাজয় ও ইসলাম গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া ইহা 'রসুল বিজয়' জাতীয় গ্রন্থ। পুঁথিটির বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। ইহাতে অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ রহিয়াছে। বিষয়বস্তুর নামগুলি ব্যতীত সমস্তই কাল্পনিক।

দুল্লা মজলিস—সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল করিম খন্দকার (আরাকানী) এই বিচিত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। ইহা ৩৩ বাবে বা অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। ইহাতে হযরত আদম, ইব্রাহীম, নুহ, শোয়েব, মুছা, ছোলেমান, ঈসা (আঃ) ও হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) প্রমুখ নবীগণের কাহিনীর সহিত হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), খালেদ (রাঃ), বেলাল (রাঃ), হাসান বসরী (রাঃ) প্রমুখের কথা এবং তদুপরি রোজা, নামায ও বেহেশ্তের বিবরণ আছে। গ্রন্থখানি রচনার তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত 'পুঁথি পরিচিতি'তে ১৭৪৫ খৃঃ ও মরহুম ডাঃ এনামুল হক প্রণীত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'তে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ রহিয়াছে।

'রসুল বিজয়'—একাধিক কবি এই নামে পুঁথি রচনা করেন। যেমন ১। কবি জঈন উদ্দীন (রচনাকাল ১৪৭১—৮১ খৃঃ) ২। সৈয়দ সুলতান (১৫৫০—১৬৪৮ খৃঃ), ৩। শাহ বারিদ খান (১৪৮০—১৫৫০ খৃঃ) ৪। সৈয়দ বা শায়খ চান্দ (১৫৬০—১৬২৫ খৃঃ) ৫। আকিল মোহাম্মদ ৬। গোলাম রসুল, ৭। সোলায়মান প্রমুখ। সৈয়দ সুলতানের 'রসুল

বিজয়' কাব্যের আলোচনা তদীয় গ্রন্থাবলীর উপর রচিত সমালোচনার সঙ্গে থাকিবে। এখানে অন্যান্যদের কয়েকটি গ্রন্থের সমীক্ষা প্রদত্ত হইল।

কবি জঈন উদ্দীনের 'রসুল বিজয়'—মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মুসলিম কবিদের গতানুগতিক মনোবৃত্তি ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে অনীহার কারণে মুসলিম ঐতিহ্যের বাস্তব প্রতিফলন স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। ফলে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' জাতীয় কাব্যের অনুসরণে কবি জঈন উদ্দীন 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনা করেন (১৪৭৯ খৃঃ)। বীর রস প্রধান এই সব 'বিজয়' কাব্যে ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবোধের কোন সত্য ও যথার্থ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে, শূণ্য পুরাণের প্রভাবাধীনে মুখরিত না হইয়া জঈন উদ্দীন যে 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনার আত্মনিয়োগে উৎসাহী হইলেন তাহার মূলে রহিয়াছে নূতন জীবন দর্শন সম্পর্কে কবির দুর্নিবার কৌতুহল। কিন্তু মূল্যবোধের অভাবজনিত কারণে তিনি বিজয় কাব্য রচনায় কোন স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। ফলে ভাষা, উপমা ও চিত্র কল্প ব্যবহারে তিনি পুরাণী পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। এই জাতীয় কাহিনী কাব্যে শুধু যে ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহাই নহে বরং ভাব কল্পনা ও গঠন রূপেও হিন্দুয়ানী রীতি ও সংস্কৃতি অনুসৃত হইয়াছে। ফলস্বরূপ রূপ বর্ণনায় কিংবা কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কল্পনা শক্তির অতিরেক দোষ আশ্রয় পাইয়াছে এবং যথার্থ মূল্যবোধ্যের অভাবে সর্বত্র অলৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। জীবন-চরিতমূলক কাব্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাতা আমিনার রূপ-সুষমা বর্ণিত হইয়াছে দেব দেবীর রূপ বর্ণনার আদলে।—(মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য)।

স্বল্প শিক্ষিত কবি তদীয় নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় ইসলাম ধর্ম ও তাহার ইতিহাসকে যেভাবে বুঝিয়াছেন তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এই কাব্যে। প্রত্যেক লেখকেরই জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিজস্ব কায়দায় রূপায়িত হইয়াছে। জঈন উদ্দীনও সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাইয়াছেন তাঁহার "রসুল বিজয়" পুঁথিতে।—(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস)।

'রসুল বিজয়' পুঁথির প্রধান বিচার্য বিষয় ইহার কাব্য সৌন্দর্য নয়, বরং কবির উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য কাব্য সৌন্দর্য দুর্বল হইয়া

পড়ে সত্য; কিন্তু মধ্যযুগের কবির নিকট কেবল কাব্য সৌন্দর্য আশা করা উচিৎ নয়। তিনি ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার-উদ্দেশ্যে এই কাব্য রচনা করেন এবং তাহা ব্যর্থ হয় নাই। আর সে জন্যই কাব্য হিসাবে গ্রন্থখানি শিল্পোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

কবি জঈন উদ্দীনের কাল নির্ণয় সহজ নয়। মরহুম ডঃ মুঃ এনামুল হক বলেন, তিনি গৌড়ের সুলতান ইউছুফ শাহের (১৪৭৪—৮১ খৃঃ) সভাকবি ছিলেন। কারণ, পুঁথির ভনিতায় কবি উল্লেখ করেন :—

"কামেল-চরণ-রেণু শিরেত করিয়া।
হীন জৈনুদ্দীন কহে পাঞ্চালী রচিয়া।
শ্রীযুক্ত ইউছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত
রসুল বিজয়-বাণী কৌতকে শুনন্ত।।"

প্রাচীন বাংলা কাব্যে বিজয় কাব্যের নমুনা পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় "বিজয় কাব্য" মানে দেবতার জয়-যাত্রা বা বিজয় কাহিনী। কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে 'মঙ্গল' ও ভক্তির চোখে দেখিলে 'বিজয়'।" আবার ডঃ এনামুল হক বলেন—"প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিজয় কাব্য এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট হইল লৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর মধ্য দিয়া নায়কের মাহাত্ম্য প্রচার। জৈনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়'ও এই শ্রেণীর কাব্য। ইহাতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণিত আছে।"

সুকুমার সেনের মতে 'রসুল বিজয়' "হযরত মুহম্মদের (দঃ) জীবন-চরিত্রের বিশিষ্ট নাম এবং এই 'রসুল বিজয়' দিয়েই বাংলাভাষার চোখে-দেখা রক্ত-মাংসের মানুষ-জীবন-কথা বা চরিত-কথা লেখা শুরু।"—(ইসলামী বাংলা সাহিত্য)।

'রসুল বিজয়' কাব্যটি কেহ কেহ কোন ফারসী কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ফারসী সাহিত্যে স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নায়ক করিয়া এইরূপ কাল্পনিক কাব্য আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নাই। ফারসী সাহিত্যের ইতিহাসেও এ ধরণের কল্পনা-প্রসূত সাহিত্যের উল্লেখ নাই।

কারণ স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে এইরূপ কাল্পনিক কাব্য রচনা তাঁহার নামে মিথ্যা রটনার শামিল। আর হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে আমার সম্বন্ধে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলে সে যেন দোজখের মধ্যে নিজের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লয়।" (বোখারী, মিশকাত)। তবে কাব্যটি মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ ফারসী সাহিত্যে "জয়কুম" নামটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রাচীন কিংবা আধুনিক সাহিত্যে কোথাও এই ধরণের অর্থহীন বা আধা-বাংলা আধা অর্থহীন নাম পাওয়া যায় না।

'রসূল বিজয়' কাব্যের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের শেষ নবী এবং জয়কুম ছিলেন ইরাকরাজ। মদীনা হইতে ছয় মাসের পথ দূরের এই জয়কুম রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন হযরত (সাঃ)। জয়কুম রাজার দেশে উভয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহাই পুঁথিটির বর্ণিত বিষয়। জয়কুম ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে অনেকে মনে করেন। তিনি আরমেনিয়ার রাজা ছিলেন। কবি রসূল-পক্ষীয় রণসজ্জার বর্ণনা দিয়াছেন অপূর্বরূপে। জয়কুম রাজাও ঘুমাইয়া রইলেন না। তিনিও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথে রাজার দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে আপত্তিকর ভাষায় যখন হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে রাজার বাণী শুনাইল তখন,

এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা,
অনল বরণ হই গর্জিয়া উঠিলা।
কোটলা তুড়িয়া আলি করিব বাদশাই,
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গাই।
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গরু,
সেই শের থোন দিমু তোমার রাজার জরু।

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) চর মারফত জয়কুম রাজকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন না। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) জয়কুম রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয় পক্ষে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল,

শেরে খোদা হযরত আলী সাজিতে লাগিল।
আশী মণ লোহার টোপ শিরে তুলি দিল।।
চল্লিশ মণ লোহার কাটার কোমরে গুঁজিল।
দশ মণ লোহার গদা হস্তে তুলি লইল।।

জয়কুম রাজাও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন—

সুসজ্জ হইয়া সব আজ্ঞা পাই সার।
কিরিট কবচ সব পরিলা সুমার।।
সাজিলেক ষাট লক্ষ দল অশ্ববার।
নব সহস্র গজ ধরে প্যাটোয়ার।।

সৈন্য সামন্তদের প্রস্তুতি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে জয়কুম রাজ নিজেও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন। তাহার—

সর্বাঙ্গ জড়িত আছে নানা রত্ন সার।
হীরার লাগাম শোভে দোয়াল মুক্তার।।

এইরূপ সাজ গ্রহণ করিয়া—

"দেখিতে সুন্দর এক অশ্ব কতুক গমন।
বহিতে সুধার গতি চলিতে পবন।।"

ঘোড়ায় যুদ্ধে গমন করেন এবং যথাসময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল—

গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্তে পেশাপেশি।
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মিশামিশি ।।
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
বরিষার মেঘে যেন বরিষা সমন ।।

যুদ্ধে জয় লাভ করা জয়কুম রাজের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ উমর, ওসমান, হাসান, হোসেন, হানিফা প্রমুখ যোদ্ধার প্রচন্ড বিক্রম অতুলনীয়। তদুপরি—

মহামল্ল বীর আলী তালিব নন্দন।
একে একে সভানেক সংহারে কেপে মন।

এই যুদ্ধে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জয় লাভ হইল। জয়কুম রাজ পরাজিত হইলেন। নবী পক্ষীয়দের প্রচন্ড বিক্রম দেখিয়া—

"ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
পদয়াকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।।"

পলাইয়া গিয়া রাজ সৈন্যগণ নৃপতির নিকট বলিল যে,

এক বীর নাম আলী ভুবন বিখ্যাত।
এক বীর সর্ব সৈন্য করএ নিপাত।।
তাহার সাক্ষাৎ যুদ্ধ কেহ নাহি করে।
সিংহনাদ শুনি তার সর্বসৈন্য মরে।।

যুদ্ধশেষে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার সৈন্যসহ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। উভয় পক্ষ বিশ্রাম করিতে লাগিল। পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। যথারীতি আয়োজনান্তে উভয়ে আবার যুদ্ধের সম্মুখীন হইল। এইভাবে কয়েক দিন যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে জয়কুম রাজের তিনটি পুত্র পরাজিত ও বন্দী হইল। তখন তিনি কয়েকশত কূপ খনন করিয়া মুখে ঢাকনা দিয়া দিলেন। আলী কূপে পড়িয়া গেলেন। হযরত (সাঃ) আলীর উদ্ধার সাধনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। অন্য দিকে ঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হানিফা হযরত আলীকে কূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরে শর বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির! হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার ক্ষতে হাত বুলাইয়া দিলে তিনি আরোগ্য হইলেন। পরদিন হজরত আলী যুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন। পুঁথিখানি এইখানে খন্ডিত। তবে পরিণাম অনুমান সহজসাধ্য। তাহা এই—জয়কুম রাজার পরাজয় ও স্বরাজ্য ইসলাম গ্রহণ। —(মুসলিম বাংলা সাহিত্য)।

যুদ্ধের ভয়বহতার বর্ণনায় কবি-সাফল্য উল্লেখযোগ্য। যেমন—

"যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার।
গদা এরি লয় দিয়া ধাহিত সত্বর।।
কিংবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু।
সে সব এ যুদ্ধে দেখি পলাইত অরন্য।"

কেবল আল্লাহর নাম প্রচার ও ইসলামের প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত গ্রহণ করিয়া রচিত "রসুল বিজয়" পুথিতে আদর্শনিষ্ঠ জাতি ও ধর্মগর্বিত কল্পনাপ্রবণ কবির মানসিকতার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই কবির কল্পনায় মুসলমানেরা কাফেরদিগকে বলিতেছেন—

"কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট,
ঝাট করি ভেট আসি তাহার নিকট।
তাহান কলিমা কহ এ মন্ত্র জপএ,
কোটি জন্মে পাপ সেই ক্ষণে ক্ষমএ।।"

এখানে উল্লেখ্য যে আরব দেশ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বাংলার কবির সেই দেশের মানুষের জীবন জীবিকা ও আচার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজেই কাব্যে আরবীয় পরিবেশ অনুপস্থিত। মরু আরবের কাহিনীতে কবি অজ্ঞাতে দেশী আবহাওয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই আরবেরা ভাত খায়, ছেলের নাম রাখে রত্ন, লড়াই করে ভারতীয় অস্ত্রে। অনেক উপমাই পুরাণী কাহিনী ও রামায়ণ-মহাভারতের অন্তর্গত। যেমন, ভীম, অভিমন্যু, শূল, বাণ, মঙ্গল বিধান, ছত্র, গরুড়, কল্পতরু, হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি। 'তাজ' 'কাবাই' প্রভৃতিও পরিত্যক্ত হয় নাই।—(পুথি সাহিত্যের ইতিহাস।)

শাহ বারিদ খানের 'রসুল বিজয়'—শাহ বারিদ খান (সাবিরিদ খান) চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার উক্ত পুথি ৪০০ বৎসরের প্রাচীন। আদ্যন্ত খণ্ডিত। কবি জইনউদ্দীনের আদর্শেই সাবিরিদ খান এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বিষয়বস্তুও ইরাকরাজ জয়কুমের সঙ্গে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর যুদ্ধের বৃত্তান্ত। বিষয়বস্তু এক হইলেও নবী পক্ষের যোদ্ধাগণের মধ্যে খুবাইলের বীরত্বকে এই পুথিতে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ শেষে খুবাইলের সহিত রাজ দুহিতার বিবাহ হয়। তবে কাব্যের পরিবেশন রীতি কবি জইনউদ্দীন হইতে পৃথক। পুথিটির পত্র পাঠ দেখিলেই তাহা পরিস্কার হইবে। যেমনঃ ১। আলীর কৃতিত্ব ২। জয়কুমের পুত্রশোক ৩। আলী ও মুলক শাহর লড়াই ৪। খাখানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ যুদ্ধ ৫। পরিখা খনন ৬। কওয়ামের যুদ্ধ ৭। বিবাহোৎসব, জয়কুমের কন্যার বিবাহ।

জয়কুমের কনিষ্ঠ পুত্র সেনাপতি হিসাবে দ্বিতীয় যুদ্ধে হযরত আলীর হাতে পরাজিত ও বন্দী হন। মেজো পুত্রও তৃতীয় যুদ্ধে একই দশা প্রাপ্ত হন। সেজো পুত্র খাখানের চতুর্থ যুদ্ধে হানিফার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ও বন্দী হন। তাহার পক্ষে ছিল কাওকাস প্রভৃতি সহস্র কুমার। আর নবী পক্ষে ছিলেন, আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, আবু জোয়ার, মাবিয়া ও হানিফা, হাসান, হোসেন, আবদুল্লাহ প্রমুখ আলীর অষ্টাদশ সন্তান এবং ছায়াদ, ওক্কাস ও খুবাইল। খুবাইলের বীরত্ব সম্বন্ধে কবি বলেন—

"যাহাকে গুরুজ-ঘাত খুবাইলে করে।
খণ্ড খন্ড হই তনু ভুমি তলে পড়ে।।"

কয়েকদিন যুদ্ধের পরও কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় অবশেষে রসুলও অস্ত্র ধারণ করিলেন, "আল্লাহকে স্মরিয়া নবী করিয়া জিকির"। যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর জয়কুম রাজ পুত্রসহ ইসলাম কবুল করিলে দুই পক্ষের মিলন হইল। জয়কুম তখন 'রসুলক লই গেলা নিজ পুরী রঙ্গে'। তখন রসুলে প্রস্তাব করিলেন ঃ—

এক বাক্য বলি আমি শুন মহারাজ।
কুলশীল পুন্যবন্ত জ্ঞানবন্ত অতি।
খুবাইল মহামন্ত্রী আমা সেনাপতি।
আমা প্রতি নরপতি যদি কর দয়া।
খুবাইলে বিহা দেও তোমার তনয়া।

রাজা প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ও উৎসবের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন।

প্রধান শত্রুর পরাজয়ে আনন্দিত রসুলে আলীকে অভিনন্দিত করিলেন ঃ—

"প্রমোদিত রসুলে প্রশংসি বলিলা।
মিত্রভাবে আল্লায় তোমাক জয় দিলা।।
আল্লার কেশরী তুমি ন থাকিতে যদি।
তবে তাকে ধরি আনি কে করিত বন্দী।।"

রসুলকে এইরূপ যুদ্ধের প্রেরণা দিয়াছে ইসলাম প্রচার-বাঞ্ছা। কাজেই কবির মতে ইহা এক প্রকার জেহাদ। তাই রসুল বিজয়—

যে পড়ে যে শুনে পাপ বিনাস।
পুণ্যফলে হও বিহিস্তে বাস।"

শেখ চান্দের 'রসুল বিজয়'—(প্রকাশ ১৬১২ খৃঃ) পরবর্তীকালে শেখ চান্দ বা সৈয়দ চান্দ অপেক্ষাকৃত ইতিহাস ভিত্তিক 'রসুল বিজয়' পুথি রচনা করেন। ইহাই কবির শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ কাব্য। ইহা অতি বিপুলাকার কাব্যগ্রন্থও। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে শেষ নবীর আলোচনা পর্যন্ত আছে। তবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূত জীবনী এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। কবি তত্ত্বদর্শী পুরুষ। তাঁহার রচনার সর্বত্র সেই আধ্যাত্ম সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুথিটি তাহার পীর শাহ দওলার আদেশে রচিত। কবি বলেন—

"ফতে মোহাম্মদ-সুত শেখ চান্দ নাম।।
গুরুর আজ্ঞায় পাঞ্চালি রচিত অনুপাম।
কাছাছোল আম্বিয়া এক কিতাবেতে শুনি।
পাঁচালীর বন্ধে রচে পুস্তকেতে পুনি।।"

রসুল বিজয়ের শেষার্ধে ১২৬ অধ্যায়ের এক বৃহৎ অংশকে কবি 'শবে মে'রাজ' নামে অভিহিত করিয়া হযরতের মে'রাজের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাব্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—১। ইবলিসের শোক ২। তালিব নিধন ৩। সুবারিজের স্ত্রীর শাস্তি ৪। গোয়ালার ইসলাম গ্রহণ ৫। জকিনামা ৬। মুরীদের কথা প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি আসল পুস্তকের বিষয়বস্তুর সহিত কিভাবে সম্পর্কিত তাহা বুঝা কঠিন। কবির বর্ণনায় মনে হয় ইহাও কাছাছুল আম্বিয়া গ্রন্থের ভাবাবলম্বনে রচিত। —(মুসলিম বাংলা সাহিত্য)। তবে এই পুথি সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩ খৃঃ) এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যেমন ইহা "হযরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী গ্রন্থ। তবে ইহাতে অনেক অলৌকিক

ও অদ্ভূত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বকথাও কম নাই।- - --৪০তম অধ্যায়ে "হালিমার কেচ্ছা সমেপান্ত" হইয়াছে। "৩২ বৈদ্ধাতে রসুলের কোরান পড়ন সমাপ্ত।" পুঁথির একটি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"অজুর বিধান যত আদ্যেতে কহিছে।
রসুলের স্থানে তবে ওমরে পুছিছে ॥
এক কথা দুই খানে কহিলে কি ফল।
ছএ চিজের এক চিজ অজু সুনির্মল ॥"

—পুঁথি পরিচিতি।

শেখ চান্দের পুঁথি খানা 'রসুল নামা' ও 'মোহাম্মদ বিজয়' নামেও পাওয়া গিয়াছে। এই বিরাট পুঁথির ৯০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যাপক আলী আহাম্মদ উদ্ধার করিয়াছেন।—(বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ, প্রথম খন্ড)।

সৈয়দ সুলতান গ্রন্থাবলী—সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃঃ) ছিলেন সাধক মহাকবি। গুরুও বটে। কবির পদকার হিসাবেও একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায় "সুফী ও যোগী সাধক সৈয়দ সুলতানের কবিত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার পদাবলীতে।" মধ্যযুগের এমন শক্তিশালী কবি ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারার্থে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন কাহিনী নিয়া নিম্নোক্ত পুঁথিগুলি রচনা করেন।

১। ***নবী বংশ***—সৃষ্টি পত্তন হইতে শুরু করিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত পর্যন্ত ঘটনার বর্ণনা।

২। ***শবে মেরাজ***—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেরাজের বর্ণনা ও তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভের ঘটনার সমাবেশ।

৩। ***রসুল বিজয়***—মেরাজের পর মহানবী (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারের বিবরণ। 'জয়কুম রাজার লড়াই' সম্ভবতঃ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৪। **ওফাতে রসুল**—ইহা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাত সম্বন্ধীয় এক অর্ধ-ঐতিহাসিক বেদনা-করুণ কাহিনী। ইহাতে হযরতের তিরোভাব হইতে খুলাফা-ই রাশেদীনের সময়ের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনার বিবরণও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৫। **রসুল চরিত**—ইহা 'ওফাতে রসূল' এর সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে। আবার পৃথক একটি পুঁথিও এই নামে পাওয়া গিয়াছে (পুঁথি পরিচিতি দ্রঃ)। ইহাতে হযরতের চরিত-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, কবির এই পরিকল্পনায় 'নবী বংশ' এর শেষাংশ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত হইতে শুরু করিয়া 'ওফাতে রসূল' তথা 'রসূল-চরিত' পর্যন্ত গ্রন্থগুলি একত্র করিলে কতকটা ঐতিহাসিক, কতকটা কিংবদন্তীমূলক আর কতকটা কাল্পনিক বিবরণ মিলিয়া শেষ নবী (সাঃ) এর একখানি পূর্ণ জীবনী পাওয়া যায়।

উপরোক্ত পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে প্রদান করা হইল।

(ক) **'নবী বংশ'**—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরাট কর্মময় পূত জীবন ও ধর্ম প্রচার অবলম্বন করিয়াই সৈয়দ সুলতানের কাব্য-জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। কবির গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'নবী বংশ' কাব্যটিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ বলা যায়। ডঃ এনামুল হক বলেন, "নবী বংশ কাব্যটিকে 'ম্যাগনাম ওপাস' (Magnum opus) বা কবির শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। ইহা বিষয় বৈচিত্র ও আকারে সপ্তকান্ড রামায়ণকেও হার মানাইয়াছে।" কবি আরবী ভাষা হইতে "বঙ্গদেশী বুঝে মত প্রচারিয়া দিলু" বলিয়া গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গ ভাষায় করেন। গ্রন্থটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লাহ কিভাবে প্রথম পয়গম্বর হইতে সর্বশেষ রসূল পর্যন্ত সকল নবী মারফত তদীয় একত্ব জারী করিয়াছেন, তাহার বিশদ আলোচনা। বঙ্গদেশীগণ, 'ভারত কথা' প্রভৃতি অনৈসলামিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইসলামের ভাবধারা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে মনে করিয়া কবি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করেন। তাই তিনি ইসলামী ভাবধারা প্রচারার্থে এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলেন—

"যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হইল।
যেরূপে যথেক পয়গম্বর উপছিল।।
বঙ্গেত এসব কথা কেহ না জানিল।
নবী বংশ পাঁচালীতে সকলে শুনিল।।"

কবি তাঁহার 'নবীবংশ' কাব্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও হরি বা কৃষ্ণ অবতারকে নবীরূপে চিহ্নিত করিয়া যথাক্রমে সাম, যজু, ঋক ও অথর্ব—এই চারিটি আসমানী কিতাব লাভ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে যাহা বেদ, তাহাই শ্রুতি, তাহাই আসমানী কিতাব বটে। কবির ভাষায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে ঃ—

"এই চারি বেদে সাক্ষী দিচ্ছে করতার।
অবশেষে মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।।"

'নবীবংশ' গ্রন্থটি 'কাছাছোল আম্বিয়া' জাতীয় মৌলিক কাব্য। ইসলামের নবীদের সঙ্গে ইহাতে হিন্দু অবতারদের নাম উল্লেখিত হইয়াছে আর 'নবী' শব্দের বাংলা অনুবাদ 'অবতার'ই করা হইয়াছে। ডঃ এনামুল হকের মতে "ভাবের ঔদার্যে, কল্পনার বিলাসে, সৌন্দর্যবোধের চমৎকারিত্বে তাঁহার ভাষা কাব্যখানির সর্বত্র যেরূপ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতিতে নানা ছন্দে ঝংকৃত হইয়া উৎসারিত হইয়াছে, তাহার তুলনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একরূপ বিরল।" —(মুসলিম বাংলা সাহিত্য)। আবদুল করিম খন্দকার (আরাকানী)-ও 'নবী-বংশ' নামে একটি পুঁথি রচনা করেন।

(খ) **শ'বে মেরাজ**—বিরাটাকারের এই কাব্যখানি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দিদারে এলাহীর বিচিত্র কাহিনী। কবি ৯৯৪ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে এই কাব্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের আরম্ভে কবি উল্লেখ করেন—

"আরবী ফার্সীভাষে কিতাব বহুত।
আলিমনে বুঝে ন বুঝে মূর্খসূত।।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রসুলের কথা যত কহিমু অধিক।।"

তাই নামে 'শ'বে মেরাজ' হইলেও ইহা শুধুমাত্র মে'রাজ বা হযরতের স্বর্গ ভ্রমণ বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ নহে। যে রাত্রে হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর মে'রাজ বা আধ্যাত্মিক উন্নয়ন অর্থাৎ স্বর্গ-পরিভ্রমণ ঘটনা ঘটে, সেই রাত্রির ঘটনার বর্ণনা দানই এই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও হযরতের তাওয়াল্লাদ বা জন্মবৃত্তান্ত হইতে শুরু করিয়া মে'রাজ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী এই কাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। মে'রাজ রাত্রে জিবরাইল ফেরেস্তা 'বুররাক' বাহনসহ হযরতের সম্মুখে উপস্থিত, তিনি হযরতকে আসমানে লইয়া যাইবেন; অথচ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তাই জিব-রাঈল হযরতের নিকট নিম্নলিখিত আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন। নমরুদ কর্তৃক হযরত ইব্রাহীম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে পর—

"মুঞি সঙ্গে ন থাকিতুম যদি সেই কালে।
দহিত তাহান অংগ জ্বলন্ত অংগারে।।
ফেরাউন যখনে মুছার লাগ পৈল।
সমুদ্রের কুলে নিয়া মারিতে চাহিল।।
মুঞি ন থাকিতুম যদি তাঁহার সহিত।
সাগরেত বাহাল ন হৈত কদাচিত।।
মুঞি যে আঁছিলুং ইছা পয়গম্বর সনে।
যখনে মারিতে গেল ইহুদেরগণে।।
মুঞি তানে ইংগিতে অন্তর করি থুইলুং।
ইহুদের হাথেত ইহুদ কাটাইলুং।।
পৃথিবীতে যথেক রসুল হইয়াছে।
মুঞি সে আইসম যাম সভানের কাছে।।
মোর নাম জিব্রাইল জান মহাশয়।
আল্লার ফরমানে আইলুম তোক্ষার আলয়।।"

অতঃপর জিবরাইল সমভিব্যাহারে মহানবী (সাঃ) এর আসমান, বেহেশত ও দোজখ প্রভৃতি পরিক্রমা, বিভিন্ন আসমানে ফেরেশতা ও বিভিন্ন নবীর সহিত সাক্ষাৎ, বেহেশতে হুরী বা বিদ্যাধরিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং অনু-

রূপ বহু ঘটনায় এই পুস্তকটি একদিকে যেমন বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে, তেমনই অন্যদিকে বিষয়-বৈচিত্র্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সর্বশেষ নবী (সাঃ)-কে ঊর্ধাকাশে নিবার জন্য ফেরেশতাগণকে আল্লাহ যে নির্দেশ দেন তাহা কবির কাব্য-কৌশলে নিম্নরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

তবে প্রভু নিরঞ্জন সংসারের সার,
জিব্রাইল সাক্ষাতে লাগিলা কহিবার।
ওহি যে মোর সখা মোহাম্মদ নবি,
অনুক্ষণ তাহানে মনেতে ভাবি।
সে তাহানে মর্ত্য হোন্তে আনিমু এ রাত,
দিবাম দর্শন আমি তাহান সাক্ষাৎ।
দুই মিত্র এক সিংহাসনেতে বসিমু,
অন্যে অন্যে ভাস্তি আমি আলাপ করিমু।
আলাপিয়া যথেক ফিরিস্তাগণ যাই,
আমার সাক্ষাতে তানে কহিঅ বুঝাই।
রজব চান্দের আজি সাতাইশ রাত্রি,
এই রাত্রি থাকিতে শীঘ্র গতি।
ফিরিস্তা সকলে মিলি আন গিয়া তানে,
আজি একত্র বসিমু সিংহাসনে।

(গ) **রসুল বিজয়**—ইহাও একটি সুবৃহৎ কাব্য। দীর্ঘ তুলট কাগজের দুই পিঠে পুঁথিখানি লিখিত। ইহাতে 'নবীবংশ' ও 'শ'বে মে'রাজ' প্রভৃতি রচনার সুদীর্ঘ কৈফিয়ত দেওয়া আছে। ইহাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মে'রাজের পরবর্তীকালের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ইসলাম প্রচারের বর্ণনার মাধ্যমে তাঁহার মাহাত্ম্য রচিত হইয়াছে। ইহা কবি জঈনউদ্দীনের 'রসুল বিজয়' জাতীয় গ্রন্থ। 'জয়কুম রাজার লড়াই' নামক আধা-কাল্পনিক পুঁথিটি এই কাব্যের একটি অংশ বলিয়া মনে হয়। মোটকথা ইহা হযরতের সংগ্রামী জীবনের এক চমৎকার আলেখ্য।

(ঘ) **ওফাতে রসুল**—কবি সৈয়দ সুলতানের অন্যান্য গ্রন্থের আকারের তুলনায় ইহা একখানি ক্ষুদ্র কাব্য। দীর্ঘ তুলট কাগজের দুই পিঠে

লেখা ২৫ পৃষ্ঠায় কাব্যখানি সমাপ্ত। কাব্যখানিকে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ 'নবী বংশ' নামক কাব্যের একাংশ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আসলে তাহা নহে।—(মুসলিম বাংলা সাহিত্য)। ইহাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কাব্যটিতে কবির পূর্ববর্তী রচনার মাধুর্য একরূপ নাই বলিলেও চলে। বিষয়টি মুসলমানদের পক্ষে যে অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়বিদারক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রধান করুণ রস এই কাব্যে সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। কবি বৃদ্ধ বয়সে রস প্রকাশে অক্ষম ছিলেন বলিয়াই কাব্যটি এইরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজরাইল ফেরেশতা কিভাবে হযরতের প্রাণ হরণ করিলেন এবং হযরত কিভাবে তাঁহার উম্মতদের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, সেই চিত্রটি যতখানি করুণ ও ভাবগম্ভীর হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। আজরাইল কর্তৃক হযরতের রুহ মোবারক কবজের দৃশ্য কবির ভাষায় এইরূপ। রসুলুল্লাহ (সাঃ) আজরাইলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"জথেক তোমার শক্তি থাকে বল দিয়া।
লই যাও তুমি মোর পরাণ কাড়িয়া।।
মোর উম্মতের দুঃখ বহুল না দিবা।
উম্মতের লাগি মোরে দুঃখ দিয়া নিবা।।
আজরাইল বোলিলেন্ত তোহ্মার পরাণ।
হরিমু জেহেন শিশু দুগ্ধ করে পান।।

রছুলে শুনি মৃত্যু পতির বচন।
হৃদয়েত ডাইন কর রাখিল তখন।।
বাম উরু পরেত রাখিয়া বাম কর।
উধর্বমুখী হইয়া রহিলা পয়গম্বর।।... ...

আজরাইলে এলাহীর নাম লেখি করে।
রাখিলা আপন কর নবীর গোচরে।।
তাহার দর্শনে জেন উড়িল বহুরী।
নিকলিল আত্মা নবীর দেহ ছাড়ি।।

তথাপি, বিষয়-মাহাত্ম্যে পুস্তকটি বহুল প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার বহু প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। কাব্যের ভক্তি সুধামিশ্রিত আবেদন পাঠকের চিত্তকে বিমোহিত করে।

অধ্যাপক আলী আহাম্মদ 'ওফাতে রসুল' কাব্যখানা সংকলন ও সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি পুঁথিটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন—"হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইসলাম ধর্ম বিস্তারে সন্তোষ লাভ করেন ও আল্লাহ তা'আলার স্তুতি করিতে থাকেন। কিন্তু বিপথগামী অনুবর্তীগণের (উম্মতের) জন্য চিন্তান্বিত হন। জিবরাইল ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেন যে, যে সকল অনুসরণকারী কলেমা বলিবে ও 'ইমা ইসলাম' জানিবে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে।"

"ইহার পরে হযরতের মদীনা হইতে মক্কায় হজ্ব করিতে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। মক্কা শরীফ হইতে হজ্ব সমাপণ করিয়া হযরত মদীনায় গমন করেন ও হযরত শহীদ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। খয়বরবাসীগণ একবার হযরতকে বিষ-মিশান মাংস দিয়াছিল। সেই বিষ হযরতের শরীরে পুনর্বার ক্রিয়া করিতে থাকে। অবশেষে মৃত্যু আসন্ন হইলে জিবরাইল ও আজরাইল ফেরেশতাদ্বয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। হযরতের অনুমতিক্রমে আজরাইল ফেরেশতা তাঁহার আত্মা লইয়া প্রস্থান করেন। হযরতের মৃত্যুর পর চারি খলিফা রাজ্যভার পান।"

হযরতের মৃত্যুই পুঁথির প্রধান উপজীব্য। কবি মহানবীর মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়াছেন তাঁহার প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের স্বপ্নের মারফত। একটি স্বপ্ন কবির ভাষাতেই বর্ণিত হইল—

"প্রথম স্বপ্ন আবু বক্রে যে দেখিল।
নবীর সাক্ষাতে সেই স্বপ্ন পরীক্ষিল।।
মেঘবর্ণ চাদর আমি মুণ্ডেতে দিয়া।
সমাজেতে আসিয়াছি বদন ঘুরিয়া।।
রসুল বলিল এহি স্বপ্ন যে দেখএ।
নিশ্চয় তার জামাতা মরএ।।"

এই সকল অদ্ভুদ স্বপ্ন দ্বারা আল্লাহর রসুলের মৃত্যুর ছায়া সকলের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে।

কবি সৈয়দ সুলতান আল্লাহর রসুলের শেষ কৃত্য সম্পর্কে বলেন :—

"অন্তরীক্ষ ডাক যদি সভানে শুনিল।।
পৌরণ নবীর যে গাত্রর না কাড়িলা।।
আসাম, আনেস আর ছবির কুমার।
লাগিল এ সবে জল জোগাইয়া দিবার।।
ধোলাইতে লাগিলেন্ত আলী মহাশয় এ।
যেমত প্রকাশ লেখা কিতাবে আছে এ।।"

'ওফাতে-রসুল' পুঁথিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"তবে যদি পয়গম্বর শরীর এড়িল।
সবে মিলে আবু বকরেরে রাজ্য দিল।।
এ দুই বছর তিন মাস দুই দিন।
রাজ্যদেশ পালিলেন্ত হইয়া প্রবীণ।।"

(ঙ) **রসুল-চরিত**—১০৮ পৃষ্ঠার একটি পুঁথি 'রসুল-চরিত' নামে পাওয়া গিয়াছে। আবার 'ওফাতে-রসুল' ও 'রসুল-চরিত' পুঁথি দুইটি একত্রে গ্রথিত বলিয়া জানা গিয়াছে। পুস্তকটির শেষ চারিটি চরণ নিম্নরূপ। (অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মোহাম্মদ জমিও 'রসুল-চরিত' শীর্ষক একখানি পুঁথি রচনা করেন।—পুঁথি পরিচিতি দ্রষ্টব্য।)

"তোক্ষারে তোক্ষার মিত্রে প্রসাদ করিছে।
তাথুধিক প্রসাদ দিবার নাহি পাছে।।
এ বোল সুনিআ সব আছববার গণ।
সন্তোস হইলা অতি সভানের মন।।"

কবি সৈয়দ সুলতানের কাব্যগুলি ইসলামের বিরাট অবদান সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে সহায়তা করে। এত বড় পরিকল্পনায় অন্য

কেহ ইসলামের বাণী তথা আল্লাহ্‌র রসুলের বাণী প্রচার করেন নাই। কবি আরবী-ফারসী শব্দ বর্জিত সংস্কৃত ঘেষা বাংলাতেই কাব্য রচনা করেন। তবে তিনি ইসলাম ধর্মীয় শব্দগুলি সুকৌশলে নিখুঁতভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। কবির ভাষায় কোন জড়তা নাই। কবি একজন ইসলামী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি কোরআন ও হাদিসের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া তাহার মর্ম যথাস্থানে নিপুনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

তরীকায়ে মুস্তফা—মুন্সী ফসীহুদ্দীন (কাব্য-জীবন—১২৭৯-১৩১৫ বাংলা) নদীয়া জিলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৩১৫ বাংলা সনে 'তরীকায়ে মুস্তফা' অর্থাৎ 'মোহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর পথ' নামক একটি পুঁথি রচনা করেন। ইহাতে হজরতের জীবনীর পরিবর্তে তাঁহার নির্দেশা-বলী তথা ইসলামের বিধান সংক্রান্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। হজরতের পবিত্র বাক্য ও কোরআনের বাণীর মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজকে বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া খাঁটি মুসলিমে পরিণত করিবার জন্য ইহা একটি উপদেশমূলক পুঁথি। সায়েরের পরিচয়ের বয়ান সহ তিন খন্ডে লিখিত এই পুঁথিটিতে মোট ২৮টি অধ্যায় রহিয়াছে। নারীদের হক সম্বন্ধীয় অধ্যায় হইতে একটি উধৃতি নিম্নরূপ।—

"নারীদের হক আদা, কর হে নেকজাদা।।
খোবে খোদা বেহেশতের বিচে।।
নারী হকের তরে, হাদিসেতে নবীবরে।
শোন কেসা তাকীদ ফরমিছে।।
রওয়ায়েতে আছে আবি হোরেরা হইতে।
ফরমিয়াছে রসুলুল্লাহ মোবারক জাতে।।
তোমাদের মধ্যে ভাল ঈমানদার সেই।
আওরতের হক্কে যিনি করেন ভালাই।।"

পুঁথিটিতে সরল বিশ্বাসী অল্পশিক্ষিত মুসলমানগণের জন্য নবীর বাণী তথা ইসলামের শিক্ষাগুলি সহজ সরলভাবে ও কোন প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব ও কুটতর্ক ব্যতীত উপস্থাপন করা হইয়াছে। পুঁথি সাহিত্যের প্রাণ এই

সারল্যই পুস্তকটির লোক-প্রিয়তার প্রধান কারণ। ইহাতে বহু স্থানে আরবীতে মূল হাদিস উধৃত করিয়া উহার উর্দু অনুবাদ ও পরে বাংলা ছন্দে উহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

জঙ্গে খায়বার—খাইবারের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের বিশেষ অংশ। এই যুদ্ধের বিবরণ আরবী ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। পরে তাহা ফার্সী জঙ্গনামায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাতেই 'খায়বারের জঙ্গনামা'র কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়। বাংলা পুঁথি সাহিত্যেই এই কাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যে তিনখানি পুঁথি এই বিষয়ে রচিত হইয়াছে তাহার একখানি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পুঁথিখানি দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী প্রণীত। সমসাময়িককালেই দ্বিতীয় পুঁথিটি রচনা করেন মুন্সী মালে মোহাম্মদ এবং অপরটি রচনা করেন মুন্সী জনাব আলী। মালে মোহাম্মদের পুঁথি উর্দু কিতাব অনুসরণে লিখিত।

দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী ও মালে মোহাম্মদের পুঁথিতে কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ–খায়বার আল মদিনার উত্তরে অবস্থিত। বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যারা জয় লাভ করিলে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শত্রুরা পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। একটার পর একটা যুদ্ধ চলিতেই থাকে। এই যুদ্ধ গুলির একটি হইল খায়বারের যুদ্ধ। এইখানে মক্কার ইসলাম বিরোধী সেনা, বেদুইন সেনা, আবিসিনিয়ার ভাড়াটিয়া সেনা এবং খায়বারের ইহুদী—সকলে একত্র হইয়া পুনরায় মদিনার মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে। যুদ্ধের সময় ইহুদীসেনা খায়বারের লৌহনির্মিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখান হইতেই তাহারা যুদ্ধ চালাইতে থাকে। মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনা এই সমবেত শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়া কিভাবে দুর্ভেদ্য দুর্গের উপরে বিজয় পতাকা উত্তোলন করিল এবং মদিনার উত্তর দিকের উর্বর মরুদ্যান হইতে ইহুদীদিগকে চিরদিনের তরে বিতাড়িত করিল তাহার কাহিনী পয়ারে, কবিতার আকারে পুঁথিতে লিখিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে রচিত মুন্সী জনাব আলীর পুঁথিটিও উক্তরূপ ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।

কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি অনস্বীকার্য। তবে অতি কথন ও গল্প সৃষ্টির দিকে বেশী লক্ষ্য থাকায় কাহিনী পুরাপুরি ঐতিহাসিক হয় নাই যদিও গ্রন্থকারগণ তওয়ারিখের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত ইতিহাস না হইলেও এই কাহিনী অধিকাংশ বাস্তব ভিত্তিক ঐতিহাসিক উপাখ্যান যাহার সঙ্গে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র সংগ্রামী জীবন ঘনিষ্টভাবে জড়িত। আবার এই আখ্যান কাব্য বীররস প্রধান। হজরত আলী, ওমর ও খালেদ বিন অলিদ (রাঃ)-এর বীরত্বের কাহিনী ও মহানুভবতায় উক্ত ইতিহাস পরিপূর্ণ। এইরূপ জঙ্গে বদর, জঙ্গে ওহুদ প্রভৃতি পুথিগুলি ঐতিহাসিক উপাখ্যান সম্বলিত হইলেও নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক ও কাল্পনিক কাহিনীর ভারে আচ্ছন্ন-প্রায়। বীররস প্রধান এই সকল যুদ্ধ সংক্রান্ত পুথির মধ্যে দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরীর 'জঙ্গে খায়বার' গ্রন্থটির একটু আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দিনাজপুরবাসী চৌধুরী সাহেবের পুথিটি কলিকাতার মেছুয়াবাজারস্থ ওসমানিয়া লাইব্রেরী ও ঢাকার ওসমানিয়া বুক ডিপো প্রকাশ করেন। 'তেছরা জেলদে' ২৪৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পয়ার-ছন্দে রচিত পুথিটির সূচীপত্র দেখিলেই অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও কাল্পনিক কাহিনী, যেমন ওমর উম্মিয়ার কাহিনী, চোখে পড়ে। ইহাতে ইসলামের মাহাত্ম্য ও মুসলিম বীরদের কাহিনী সত্যাসত্য যাঁচাই না করিয়াই প্রচারিত হইয়াছে এবং বাংলার মানুষের অন্তরে এই সকল কাহিনী ধর্মীয় প্রেরণা জোগাইয়াছে।

শেরে খোদা হজরত আলী (রাঃ) যখন আনছার মোহাজের সৈন্যসহ যুদ্ধ করিবার জন্য খায়বার পেঁৗছিলেন তখন মদিনাতে হজরত রসুলুল্লাহকে একা দেখিয়া জহুদ খোমার নামক জনৈক কাফের শহরকে অরক্ষিত ভাবিয়া আঘাত হানিতে সসৈন্যে অগ্রসর হয়। জিবরাইল মারফত সংবাদ পাইয়া হজরত রসুল যুদ্ধ করিতে ময়দানে যান। জহুদ খোমারের সহিত রসুলুল্লার যুদ্ধের বয়ান :—

"রাসুল ময়দান যায় শূণ্যেতে জিব্রীল ধায়,
ভাবিয়া নবীর মদদ কারণ।।
জহুদ দেখিয়া তায় তাজ্জব হইয়া যায়,

ভাবিতে লাগিল মনে মন।।

যদি মন্দের তরে ধরি কোনরূপে করে,

তারিফ করিবে সর্বজন।।

নবি জহুদের সাথ কহেন মিঠা মিঠা বাত,

নরম জবান বিলক্ষণ।।

কহেন শুনহে খোমার হও তুমি হুশিয়ার,

ছেড়ে দাও দেমাগ আপন।।

খোদারে ওয়াহেদ জানো আমার হুকুম মানো,

মুসলমান হও এই ক্ষণ।।

o o o

নবি এই কথা বলে জহুদ তলওয়ার তুলে,

মাথা পরে আনিল যেমন।।

জহুদ আজেজ হয় বিনয় করিয়া কয়,

নবি মোর করহে তারণ।।

রক্ষা কর মোর তরে তোমার দীনের পরে,

ঈমান আনিয়া এই ক্ষণ।।

হজরত আলী (রাঃ) খায়বারের দুর্গ বা গড় অধিকার করে সেখানকার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাফির বাদশা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। আর অসংখ্য নারী-শিশু হজরত আলী (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের মান-মর্যাদা তিনি রক্ষা করিলেন। তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।

খায়বার গড় জয়ের বিবরণ কবি তুলিকায় নিম্নরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হজরত আলী (রাঃ) এর অধীনে—

"ঘিরিল বাদশার গড় ইসলাম লস্কর।।

বুরুজ উপরে চড়ে যত কাফেরগণ।

লইয়া পাথর ইট জঙ্গের সামান।।

নীচে থেকে মারে তীর যতেক মোমিন।

শির উঠাইতে নারে কাফের বেদীন।।

এমত দেখিল যবে হায়দার কারবার।
উতরিল দুলদুল হইতে আপনার।
জেরার দামনবন্ধ বান্দিল কোমরে।
এক হাতে তেগ আর হাতে ঢাল ধরে।।
একেবারে পৌছে গিয়া দরওয়াজার পর।
হাজার পাথর গিরে ঢালের উপর।।
তা বাদে হজরত আলী অতি জোরওয়ার।
ধরিল জিঞ্জির যত হাতে আপনার।।
হাঁকিয়া দরওয়াজা তার দিল উখাড়িয়া।
উলটিয়া একেবারে দিল ফেলাইয়া।।
দরওয়াজা খুলিল যদি তামাম লস্কর।
একেবারে সান্ধাইল গড়ের ভিতর।।"

মৌলুদ পুথি—মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) মহৎ জীবন নিয়া বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে মৌলুদ সাহিত্যে। নবীগত-প্রাণ অসংখ্য উলামা এইসবগ্রন্থ রচনা, প্রচার তথা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের পুঁথি সাহিত্যে অনেক মৌলুদের কিতাব পরিদৃষ্ট হয়। অনেক বিদগ্ধ পুঁথিকার পুঁথির ছন্দে পয়ারে নবী জীবনের বন্দনা গাহিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত পুঁথিগুলি উল্লেখযোগ্য।

(ক) কিশোরগঞ্জ জেলার মুন্সী আবদুর রহীম (রচনাকাল ১২৬৮—৯৯ বাংলা) রচনা করেন মৌলুদে আবদুর রহীম পুঁথি। (খ) মুন্সী জনাব আলী (রচনাকাল ১২৬৮-৯৭ বাংলা) ছিলেন হাওড়া জেলার অধিবাসী। তিনি রচনা করেন 'দরুদে মুজতবা' ও 'এহইয়াউল কুলুব' নামক দুইটি মৌলুদের পুঁথি। (গ) ২৪ পরগনা জেলার মুন্সী গোলাম মওলা (কাব্যকাল ১২৭৬-১৩০৮ বাংলা) ১২৮২ সালে 'মৌলুদে বাহারিয়া' নামে একটি পুঁথি রচনা ও প্রকাশ করেন। (ঘ) রংপুর জেলার মুন্সী রসুল মোহাম্মদ খন্দকার ১২৯৪ বাংলা সালে 'মৌলুদে গোলজারে বাহারিয়া' শীর্ষক একটি কাব্য রচনা করেন। (ঙ) মেদিনীপুর জেলার পীর মাওলা সৈয়দ আবদুল কাদির ১২৯৬ সালে 'গোলশানে কাদেরী' নামে একটি মৌলুদের পুঁথি

রচনা করেন। তিনি 'নাজাতে কাওসার' ও 'মাযরে ফিরদাওস' শীর্ষক দুইটি পুথিও রচনা করেন। প্রথমোক্ত পুথিটিতে তিনি হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সশরীরে মে'রাজ গমনের সমর্থনে প্রমাণাদি প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয়টিতে রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর পরলোক গমনের বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেন। (চ) বীরভুম জেলার মুহাম্মদ আতাউল্লাহ 'শামছে মোহাম্মদী' নামক একটি মৌলুদের পুথি রচনা করেন।

রসুলের 'মে'রাজ'—বরিশাল জেলার চাখার অঞ্চলের কবি ফৈজদ্দীন রচিত এই পুথিটি ইদানিং অধ্যাপক সুলতান আহম্মদ ভুইঞার সম্পাদনায় ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পুথিটি শুধু আদ্যন্ত খন্ডিতই নয়, উহার ভিতরের অংশেও কিছু পত্র পাওয়া যায় নাই। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে উহার পৃষ্ঠা সংখ্যায় না দিয়া টাকা ও আনার সাহায্যে দেওয়া হইয়াছে। লেখা ডান দিক হইতে বাম দিকে আসিয়াছে; আকার পুস্তকের মত, সাইজ ৭ ইঞ্চি×৫ ইঞ্চি। মুসলিম ধর্মীয় বিষয়ে কাব্যটি রচিত।

এক স্থানে কবি ফৈজদ্দীন তদীয় পুথি রচনার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

"লোকের খাহেষ দেখে হৈনু জার জার।
এ খাতিরে লিনু য়ামি কবিতার ভার।।
কবিতার ভার নহে জেন মুক্তার হার।
গাঁথিতে বসিনু য়ামি নামেতে য়াল্লার।"

ধর্মীয় বিষয়ে রচিত হইলেও পুথিটিতে রসুলের মে'রাজই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। তাই সম্পাদক সাহেব পুথির উক্ত রূপ নামকরণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। মহানবীর বিশাল কর্মময় সংগ্রামী পূত জীবনের উপর আলোকপাত করিতে যাইয়া কবি তাহার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেন—

নবীর তারিফ সকল লেখিব কেমনে।
লেখিয়া তারিফ আমি ওর নাহি পাই।
তেকারণে থোড়া কথা হেথা থুইয়া জাই।।

শ'বে মেরাজ ঘটনা বিবৃত হইবার পূর্বে হজরত হামজা (রাঃ) এবং মহাবীর আব্বাস (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। বিবি মেহের নেগার মুসলমান হইলেন এবং

"মেহের নেগার সাথে আইলা বহুতর।
কলেমা পড়িল আসি নবীর গোচর।।"

দিনে দিনে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতিতে ভীত হইয়া আবু জেহেলের নিকট আরববাসী—

"করজোড় করি পাপী করে নিবেদন।।
এই মহাম্মদ যদি সজীব রহিব।
পোষ্যক্রমের যে আচার সব মিটাইব।।"

মূতিপূজারীদের অনুরোধে আবু জেহেল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শির কাটিয়া আনিয়া দিবার জন্য লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করিল। কবির ভাষায়—

"যে জন মারিতে পারে দিমু বহু ধন।
এক শত উট দিমু আর রত্নধন।।
রূমী দাস-দাসী দিমু হাবশী দশজন।
স্বর্গ বিদ্যাধরী দিমু প্রথম যৌবন।।"

হযরত উমর (রাঃ) তখন আবু জেহেলের দলে ছিলেন। তিনি কিভাবে নবীকে হত্যা করিতে গিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন তাহাও অতঃপর ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসীদের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল। মহানবীর নিকট এই সকল খবর আসিতে লাগিল। নবী মুসলমানদিগকে হাবশা দেশে হিজরত করিতে পরামর্শ দিলেন। হজরত জাফর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলমানগণ নাজ্জাসীর দেশ হাবশাতে হিজরত করিলেন। কিন্তু অবিশ্বাসীকুল বহুধনসহ তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য নাজ্জাসীর নিকট দূত পাঠাইল।

আবু জেহেল—

"পত্রেত লিখিল আমার কতজন দাস।
পলাইয়া রহিল গিয়া তোমার সন্নাস।।

মোহরে যদি সে কৃপা আছে এ তোমার।
সর্বদা এ দাস ধরী দিবা যে আমার।।
এমত লিখিয়া পত্র দিল বহু ধন।
অধিক মন্যতা করি লেখীল লিখন।।"

দূতের এই বাণী পাইয়া নৃপতি নাজ্জাসী মুসলমানদের ডাকাইয়া পাঠান এবং জিজ্ঞাসা করেন—

"নৃপতি বোলেন মহাম্মদ কোনজন।
তুমি সবে তার পদ সেব কি কারণ।।
কেমন আচার তোমা এ বোলে করিবার।
কহ দেখি আমা তরে সে সব প্রচার।।"

তখন দলপতি হজরত জাফর (রাঃ) কহিতে লাগিলেন—

"মহাম্মদে বোলেন সেবিতে করতার।
এক বিনে দুই প্রভু নাজানিয় আর।।
নিসেধেন্ত সবারে মুরতি পুজিবারে।
প্রদক্ষিণ করিতে মুরতির গোচরে।।" ইত্যাদি

হযরত জাফর (রাঃ) আরও জানাইলেন যে, পক্ষান্তরে আবু জেহেল প্রভৃতি মূর্তি পূজা, সুরা পান, পরনারী ভোগ ইত্যাদি কর্ম করিতে মানুষকে নিত্য-দিন অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে। তখন—

"এতেক শুনিয়া যদি নৃপতি নজাসি।
বোলে সত্য রছুল মোনে প্রীত বাসি।"

অতঃপর পণ্ডিতগণ—

"তৌরিত ইঞ্জিল পড়ি শুনিতে লাগিল।
নবীর তারিফ যত কেতাবে পাইল।।
আবদুল্লার সুত মহাম্মদ অবশেষ।
হইবেক রছুল পালিব সব দেশ।।"

নৃপতিও ঘোষণা করিলেন যে, নিশ্চয়ই মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লার রসুল এবং বিশ্ববাসী তাহার ধর্ম গ্রহণ করিবে। কোরেশী দূতগণ ভগ্ন মনোরথ হইয়া

৫—

দেশে ফিরিয়া আসিল। এই দিকে অনেক মানুষ আল্লার নবীর নিকট আসিয়া ক্রমশঃ বয়আত গ্রহণ করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে নজাসী প্রেরিত একদল পন্ডিত লোক হজরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফিরিবার পথে আবু জেহেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাহাদিগকে বলিল—

"যদি মুসলমান হৈতে শুধা ছিল মোনে।
যুক্তি কেনে না করিলা আমা সভার সনে।।"

জেহেল পন্ডিতদিগকে সঙ্গে করিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইল—

"যদি হও রছুল তুমি মানিব তোমারে।
দুই খন্ড করি আনি দেখাও আমারে।।
এই চতুর্দ্দশী শশি আকাশ উপর।
দুই খন্ড কর তুমি সভার ভিতর।।"

আল্লার অসীম মহিমায় এবং মহানবীর আঙ্গুল সংকেতে চন্দ্র দুই খন্ড হইলে আবু জেহেল ইহাকে যাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল এবং "পালাইল শীঘ্র গতি"। পন্ডিতগণ নজাসীর নিকট গিয়া মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সত্য নবী বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিল। নজাসী নৃপতিও সিংহাসনে বসিয়া চন্দ্র দুই খন্ড হইতে দেখিয়াছেন। সুতরাং তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল।

এখানে বাংলার গ্রাম্য পুথিয়াল কবি ফৈজুদ্দীন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার সময় সর্বত্র তাহা পরিদৃশ্য হয় এবং অনেক দেশের বাদশাহ তাহা অবলোকন করেন। এমনই-ভাবে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলের রাজাও তাহা দেখিয়া বিস্ময়াভূত হন এবং সভাসদ ডাকিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কবি রাজার নাম হানিব বা ছামির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'তারিখে ফিরিস্তা' নামক গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ব কোষের সম্পাদক এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন ঃ—পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে চেরর রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছা পূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন।
—[বিশ্বকোষ (১৪)—২৩৪ পৃঃ]

দক্ষিণ ভারতে ইসলাম প্রচার সম্বন্ধীয় পুস্তিকা হইতেও জানা যায় যে, রাজা পেরুমাল ইসলাম গ্রহণ করিয়া মোঃ তাজউদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। তিনি ভাগিনার নিকট রাজ্যভার দিয়া মহানবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মক্কা গমন করেন। শেখ জইনুদ্দীন কৃত "তোহফাতুল মুজাহেদীন" শীর্ষক গ্রন্থেও এক রাজার মক্কা গমন, তাঁহার হজরত রসুলে করীম (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু রেজাল শাস্ত্র অনুসারে পরীক্ষা করিয়া সেইগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয় নাই। তোহফার মাননীয় লেখক বলেন—"রাজা কিছুকাল হজরতের খেদমতে অবস্থান করিয়া দেশে ফিরিবার সময় 'শহর' নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়—এই বিবরণ মালাবারের (পূর্বনাম চেরর ও কেরল) মুসলমান অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে মশহুর আছে। তবে অমুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, রাজাকে ঊর্ধে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন।—মাওলানা মোঃ আকরম খাঁ কৃত 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। রাজা সম্পর্কে আমাদের পুঁথিয়াল কবিও বলেন ঃ—

"কেহ বোলে রছুলের সহিত দেখা পাইল।
কেহ বোলে পন্থে যেতে স্বর্গপুরে গেল।।
অতি পুন্যবন্ত ছিল ছামির নৃপতি।
আছিল বহুল ভক্তি রছুলের প্রতি।।"

অতঃপর কবি পয়ার ছন্দে রসুলের মেরাজ বর্ণনার অধ্যায় আরম্ভ করেন। মেরাজের রাত্রিতে অর্থাৎ সাতাইশে রজব রাত্রে মহানবীর সম্মানে ইহ ও পরজগতে অনেক আশ্চার্যজনক ও অভিনব ঘটনা ঘটে। কবি সেইসব ঘটনার উল্লেখ করেন। যেমন মৃত পাপীদের শাস্তি রহিতকরণ; নরকের অনল নির্বাপিত হওয়া ও নরককুণ্ড দুর্গন্ধমুক্ত হইয়া সুগন্ধময় হওয়া (কারণ নরক পরিদর্শনে আসিবেন আজ আল্লার বিশেষ বন্ধু ও অতিথি), আকাশের অন্ধকার দূরীকরণ, বিশ্বের মানুষের নিদ্রাভিভূত হওয়া ইত্যাদি। এইরূপ অভিনব কার্য দেখিয়া ফেরেশতাগণ "অনুমান করে সবে প্রলএর বন্ধ।" জিব্রাঈল জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ বলেন—

"ভুবনে মোহর সখা মহাম্মদ নবী।
অনুদিন আমি তানে প্রেমভাব ভাবি।।
আজি তানে মর্ত্য হতে আনিব এথাত।
দিব যে দরসন আনি তাহান সাক্ষাত।।
দুই মিত্র এক সিংহাসনেত বসিব।
অন্যে অন্যে তানে মুই আলাপন করিব।।
আন গিয়া যথেক ফিরিস্তা তানে যাই।
মোহর সম্বাদ তানে কহিয় বুঝাই।।"

আল্লার অনুমতি পাইয়া ফেরেশতা কুলমনি ঈস্রাফীল, মিকাঈল, আজরাঈলকে সঙ্গে করিয়া জিব্রাঈল চলিলেন। আর—

"এক এক ফিরিস্তার সঙ্গে সত্তর হাজার।
চলিল ফিরিস্তা সব রছুল আনিবার।।"

মহানবীর ঘরে পেঁাছিয়া জিব্রাঈল মহামতি রসুলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। জিব্রাঈল আত্মপরিচয় দান করিয়া বলিলেন—

"আল্লার হুকুমে আইনু তোমার আলএ।।
তোমারে তোমার মিত্র করিছে আদেশ।
সেই আর্শ কোরমোপরে করিতে প্রবেশ।।"

জিব্রাঈল বোরাক নামক একটি অশ্ব আনিলেন। মহানবী জমজমের পবিত্র পানিতে গোসল করিয়া প্রথম বোরাকে চলিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেন এবং তথা হইতে দ্বিতীয় বোরাকে উর্ধপানে যাত্রা করিলেন। কবি বোরাকের বর্ণনা অতি চমৎকারভাবে বিধৃত করিয়াছেন, যেমন—

"বোরাকের মুন্ড মুখে নরের আকার।
চিকুর লম্বিত অতি নারীর বেবহার।।
বোরাকের মুন্ড চক্ষু উটের চরিত।
নরের বচন কহে বাক্য সুললিত।।
অশ্বের জেহেন পিষ্ট চলন গম্ভীর।
চলিতে বিজলি চলে যাইতে সুধীর।।..."

বোরাকের শরীর কস্তুরী জিনিকগন্ধ।
'কুমকুম কেনরী জিনি সর্বলোমের ছন্দ ।।
বায়াহোন্তে বোরাকের গতি দূর অন্ত।
এক কাইকে পোনর শত বছরের পন্থ ।।"

এইরূপ বোরাকে চড়িয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) চলিলেন। রাস্তায় 'দুর্মতি ইবলিছের' সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে আল্লার আদেশ অমান্য করিবার জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করিতেছে। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নবীবর এক মহা-সমুদ্র ভর্তি নারী-পুরুষ পাপীদের শাস্তি ভোগ দেখিতে পাইলেন। তিনি জানিতে চান—

"এমন দুর্গতি দেখি কিসের কারণ।
জিবরাইলে বোলে এই উম্মত মুছার।
ঐ যে দেখিতে আছ উম্মত ইছার।।
এ সকলে মিছা সাক্ষী দিছে পৃথিম্মীত।
মনুষ্যেরে প্রভু কহে লোকের বিদিত।
স্ত্রী পুত্র প্রভুর আছে এ হেন বোলে।
এ সকলে দুঃখ পায় এই পাপ ফলে।।"

শেরেকীর এই শাস্তি দর্শন করিয়া তিনি সামনে দেখিতে পাইলেন ব্যাভি-চারের কঠোর শাস্তি। অতঃপর তিনি প্রথম আকাশে গমন করেন। এখানে হযরত আদমের সঙ্গে মহানবীর ছালাম কালাম হয়। দ্বিতীয় আকাশে 'সামাইল' নামে এক ফিরিস্তার এবং তৃতীয় আকাশে হযরত মুছার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আমাদের রসুল করীম (সাঃ)-এর। এখানে তিনি চারিজন সতী নারীর টুঙ্গী দেখিতে পান। টুঙ্গিগুলি ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, সতী মরিয়ম, বিবি খোদেজা তাহেরা ও পতিব্রতা ফাতেমা বতুলার জন্য নির্দিষ্ট। চতুর্থ আকাশে তিনি হযরত ইছাকে বিষন্নমূর্তিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি (হযরত ইছা) স্বীয় উম্মতের আল্লাহ-বৈরীতার জন্য দুঃখিত আছেন। অতঃপর—

"সমুক্ষেতে হারুন নবী সঙ্গে দেখা পাইলা।
অন্যে অন্যে দুই জনে সম্ভাষা করিলা।।"

পঞ্চম আকাশে উঠিয়া হযরত (সাঃ) এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাখাবিশিষ্ট দীপ্তিমান আজরাঈলের দর্শন পাইলেন। কি প্রকারে জীবের প্রাণ হরণ করেন, জিজ্ঞাসা করিলে আজরাঈল মহানবীকে বলেন—"বৃক্ষ এক সৃজিয়াছে আকাশ উপরে ॥" এবং এই বৃক্ষের পত্রে প্রতিটি জীবের নামধাম রহিয়াছে। মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বে পত্রটি পক্কতা লাভ করিয়া যেই দিন মাটিতে পতিত হয় সেই দিনই জীবটির প্রাণ হরণ করা হয়। আজরাঈল বলেন—

"পুণ্যবন্ত হইলে দূত সঙ্গে করি।
বহুল যত্তন করি তান প্রাণ হরি ॥
যদি পাপবন্ত হয় দুষ্ট দূত লইয়া।
তাহার জীবন হরি বড় দুঃখ দিয়া ॥"

ষষ্ঠ আকাশে মহানবী (সাঃ) প্রথমে দোযখের সরদার ফেরেশতায় দর্শন পান। আল্লাহর অনুমতি লইয়া হযরত (সাঃ) সরদারসহ দোজখ দেখিতে গেলেন। তিনি (সাঃ) দোজখের ভীষণ মূর্তি দেখিয়া অচৈতন্য-প্রায় হইলেন এবং অবশেষে সরদারকে বলিলেন—

"কোন কোন দোজখের কেমন আকার।।
কেমন দোজখে মোর উম্মাত পরিব।
কিরূপে উম্মাত মোর লাঘব পাইব।।......
এত শুনি কহিলেন্ত দোজখ নৃপতি
এ সপ্ত দোজখের এই সপ্ত আকৃতি।।
প্রথম নরক মৈদ্ধে লাঘব বহুত।।
এথাএ পরিলে দুঃখ পাইব বহুত।
সত্তর হাজার দুঃখ আছে তাথে বেশ।
তথাএ পরিলে দুঃখ পাইব বিশেষ।।......
সপ্তম নরকে দুঃখ দশ হাজার থুইছে।
তোমার উম্মতের লাগি তাহাকে সৃজিছে।।"

দোজখের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া মহানবী (সাঃ) পাপী উম্মতদের জন্য চিন্তিত হইলেন। সরদার শাস্তির প্রতিটি অস্ত্র বা প্রয়োগ পদ্ধতি মহানবীর গোচরীভূত

করিলেন। অংশীবাদিতা, মিথ্যাকথন, রোজা, নামায, হজ্ব ইত্যাদি পরিত্যাগ-করণ, যাকাত না দেওয়া, সুরা পান, পরনারী ব্যবহার, পিতা-গুরুজনকে অমান্যকরণ, পরনিন্দা, পরচর্চা, পরধন গ্রাস, অহংকার, অপবিত্রতা পরিত্যাগ না করণ প্রভৃতি পাপের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি সম্বন্ধে হযরত অবহিত হইলেন। অতঃপর হযরত (সাঃ) নারী জাতির জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি অবলোকন করিয়া 'আপনা উম্মাতের লাগি বহুল চিন্তিলা'। জনক-জননী না, পাপী উম্মাতের জন্য তিনি পরিত্রাণ কামনা করেন। তাহার কারণ কবির ভাষায়ঃ

"উম্মাতের হেতু আমি রক্ষা পার।।
জনক-জননী মুই না করি উদ্ধার।
তোমা পদে মাগি আল্লা উম্মাত প্রতিকার।।
বহুলে নরক দেখি ভয় পাইলা অতি।
সপ্তম আকাশ পরে গেলা শীঘ্রগতি।।"

এই আকাশে আসিয়া নীলাকাসা জমরুদ হীরা, মনি-মানিক্য দ্বারা তৈরী একটি ঘরে নবীবর ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখিতে পাইলেন। বেহেশতের মধ্যে দেখিলেন—

"এছরাফিল নাম তান বলবন্ত অতি।
সিঙ্গ হাতে করিয়া বসিছে মহামতি।"

তিনি (সাঃ) কলম, আরশ, কুরসী ও বেহেশত দেখিতে পাইলেন। আল্লাহর অনুমতি পাইয়া জিব্রাইল হযরতকে বেহেশত পরিদর্শন করাইতে গেলেন। বেহেশতের দ্বার উম্মোচন করা হইল। মহা সাজের মধ্যে ইদ্রিস নবী এখানে বসবাস করিতেছেন। হযরতের সঙ্গে তাঁহার 'সম্ভাষা' হইল। বেহেশতের বিবিধ শাস্তি হযরত (সাঃ) দর্শন করেন। ত্রিপদী ছন্দে কবির বর্ণনা নিম্নরূপ—

"চতুর্দিকে বেহেস্তের অতি শুদ্ধ সুবর্ণের
ঘর সব জড়িত রতন।।
ঘরের উপরে টুঙ্গি নানা বর্ণ রঙ্গে রঙ্গি
অতি দীপ্তি করিছে তাহার।।

মুকুতা প্রবাল কত লাগাছে বিবিদ্য মত
দেখীতে অধিক শোভাকার।- - - -
চারিদিগে বাগিচার নদী স্রোত বহে ধার
তার মধ্যে টুঙ্গি বহুতর।
রত্ন জড়িত অতি ঘটলম্ব বিবিধ ভাতি
টুঙ্গি সব পরম সোন্দর।।

বেহেশতবাসী সব মানুষই হইবে পূর্ণ যৌবন বিশিষ্ট। সেখানে কোন বৃদ্ধ থাকিবে না। তাহাদের সেবার জন্য অসংখ্য ষোড়শী অধোমুখী চুনিমতি সদৃশ রমনী রহিয়াছে। কবি সেই পরমা সুন্দরীদের সম্বন্ধে বলেন—

"সারি শুক জিনি বাণী বচন আলাপ করি
কহে সব সে সকল মুখে।।
বেহেস্তের নারীগোন অতি হরসিত মোন
পসার দেওন্ত দ্বারে বসি।......
অধিক লম্বিত কেশ সুগন্ধি আমোদ বেশ
কস্তুরী না হয় তার সোম।।
মুখ পথএ জিনি নাম গরুরের ফনী
সম নহে অধিক উত্তাম।।
অতি সুললিত তনু ভুর যুগ দুই ধনু
কটাক্ষে জিনিয়া কামশর।
নয়ন পুতলি কালা চারিদিকে অতি ধলা
পদ্ম পরে জেহেন ভোমর।।
দসন মুকতা পাতি জর্লিব বিজলি জ্যুতি
বিজলী প্রকাশ জিনে হাস।"

বেহেস্তের চার নদী অর্থাৎ পানি, দুধ, সুরা, ও মধুর নদী দেখিবার পর হজরত বদরী বৃক্ষের নিকট আসিলেন। এখানে জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন—

মোর শক্তি নাহি একপদ আগে যাইতে।।
অনুদিন এই স্থানে মোর নিবাস।

এথা হোন্তে আগে যাইতে নাহিক প্রকাশ।।
এথা হোন্তে এক পদ আগে যাই যবে।
প্রভুর অঙ্গের জোতে অঙ্গ দহে তবে।।

এই পরিস্থিতিতে মহানবী কোন দিকে যাইবেন, কি করিবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন এমন সময় 'অন্তরীক্ষ বাণী' হইল—

"আইস আইস মহাম্মদ তুমি মহাশএ।
আমি তোমা নিজ প্রভু, না ভাবিও ভএ।।"

কতক্ষণ পরে একটি 'রথ' (অর্থাৎ রাফ রাফ) পাইয়া উহাতে হজরত (সাঃ) আরোহণ করিলেন এবং ইহা "মহিমার অম্রপটে গিয়া প্রবেসিল।" এইরূপে সত্তর হাজার অম্রপট অতিক্রম করিয়া মহানবী আল্লার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তখন—

"পদের পাদুকা এড়ি আরসেত যাইতে।
মোনে হইল রছুলের পাদুকা এড়িতে।।
হেন কালে আজ্ঞা কৈল প্রভু নিরাঞ্জন।
পদের পাদুকা তুমি এড় কি কারণ।।"

আল্লাহ বলিলেন—সতত দুদোল্যমান সিংহাসনকে স্থির থাকিবার আদেশ দিলাম যেন তোমার পদরেনুতে ধন্য হয়। ইহা শুনিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন এবং কুহুতের পাহাড়ে আরোহণ কালে মুছা নবীর পাদুকা পরিত্যাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। উত্তর হইল—

"আজ্ঞা দিল মুছারে গিরিত হাটি যাইতে।
সেই পুণ্য তার পদতে লাগিতে।।"

এইখানে আসিয়া পুস্তকটি শেষ হইয়াছে।

কবি ফৈজুদ্দীনের পুস্তকটি পড়িয়া মনে হয়, তিনি প্রাচীন ইতিহাসে বিধৃত ঘটনাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। পুঁথিটিতে সর্বত্র ইসলামী পরিভাষা ব্যবহৃত হইলেও যুগ ধর্ম হিসাবে যেন পুরাণী শব্দ ও অলংকার ইহাতে অনায়াসে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মীর গ্রন্থাবলী : মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮—১৯১২ খৃঃ) ঊনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যিক এবং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ইহাতে সাহিত্যের ইতিহাস লেখক-দের মধ্যে মতপার্থক্য নাই। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য, সামাজিক ও ধর্মীয় গ্রন্হ অর্থাৎ সাহিত্যের সর্ব অঙ্গনে তিনি অবাধে পদ সঞ্চালন করিয়াছেন। সুতরাং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মত মহান পুরুষের ছবি তাঁহার ধ্যানমগ্ন মানস হইতে দূরে যাইতে পারে নাই। তিনি মহানবী ও তাঁহার বিশিষ্ট আত্মীয়-স্বজন ও অনুসারীদের পবিত্র জীবন কাহিনীর কাব্যিক রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন নিম্নোক্ত গ্রন্হরাজির মাধ্যমে।

	গ্রন্হ	প্রকাশকাল	শ্রেণী ভাগ
১।	মৌলুদ শরীফ—	১৯০২ খৃঃ	গদ্য-পদ্য মিশ্রিত।
২।	মদিনার গৌরব—	১৯০৬ খৃঃ	কাব্য।
৩।	বিবি খোদেজার বিবাহ—	১৯০৫	কাব্য।
৪।	হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ—	১৯০৫	কাব্য।
৫।	হযরত বেলালের জীবনী—	১৯০৫	কাব্য।
৬।	হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ—	১৯০৫	কাব্য।
৭।	মোস্লেম বীরত্ব—	১৯০৭	গদ্য-পদ্য মিশ্রিত।
৮।	এসলামের জয়—	১৯০৮	গদ্য-পদ্য মিশ্রিত।

গ্রন্হগুলি কতখানি কাব্য তাহা ইহাদের নাম দেখিয়াই বুঝা যায়। কারণ পুস্তকগুলির নামকরণ একেবারে প্রবন্ধের মত। 'বিষাদ সিন্ধু'-খ্যাত মশার-রফ হোসেন মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গৌরব গাথা রচনা করেন এই সব পুস্তকের মাধ্যমে। তিনি বাংলার মুসলমানকে এইরূপে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। তবে মধ্যযুগের রচিত নবী কাহিনীমূলক অসংখ্য পুথি হইতে তিনি বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। পুথির বিষয়বস্তু লইয়া সাহিত্যে তিনি যে বাণী-রূপ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস-সন্ধানী আবার মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনুসরণকারী। তাঁহার রচনায় নানা অলৌকিক কার্যাবলীর সাবলিল বর্ণনা

ও আবেগমুগ্ধ বিহবলতা অনায়াসেই স্থান পাইয়াছে। এইসব গণতোষণকারী কাহিনী সচেতন পাঠক মনকে পুঁথির জগতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মোট-কথা তাঁহার বড় কৃতিত্ব তিনি শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবনের বাণীরূপ উপস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুঁথি সাহিত্যের রচয়িতার মত ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি অহেতুক মর্যাদাহীনতার পরিচয় দেন নাই। তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া কল্পনার প্রসারতার আশ্রয় লইয়া নিরঙ্কুশ চেতনা-লব্ধ এক জীবনের সন্ধান পাইয়াছেন।

মদিনার গৌরব ঃ ইহা মীর সাহেবের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহা হযরতের সম্পূর্ণ জীবনী নয়। তাঁহার জীবনের অংশ মাত্র। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ ১৯০৬ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় এবং ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৩২০ সালে বা ১৯১৩ ঈসায়ী সনে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০ এবং সর্গ সংখ্যা ·চৌদ্দ। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার করিবার জন্য মক্কাবাসী, বিশেষ করিয়া কোরেশ সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি নানা রকম অত্যাচার করে। যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের উপর অশেষ নির্যাতন করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেষ্টায় মক্কায় যে ক্ষুদ্র মুসলমান সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তাঁহাদের সমূলে ধ্বংস করিতে তাহারা বদ্ধ-পরিকর। এই অবস্থা তিনি মদীনায় হিজরত করিবার সিদ্ধান্ত নেন। মদীনার লোক প্রতি বৎসর মক্কায় বার্ষিক মেলায় আসেন। তাহাদের অনেকেই এই ধর্ম গ্রহণ করেন। ৬২২ সালের বার্ষিক মেলায় মক্কায় বহু লোক সমাগম হয় :—

"ছয়শত দ্বাবিংশতি খৃষ্টীয় সনেতে
বহু লোক আসিয়াছে মক্কার মেলাতে।
বৎসর বৎসর হয়, মেলা এ সময়।
দেশ দেশান্তর হ'তে জনস্রোত বয়।
অপূর্ব নগর শোভা মেলায় কয়দিন,
আড়ম্বরে পূজা হয়, প্রথা চিরদিন।"

শেষ নবী (সাঃ) রাত্রিতে গোপনে মদীনাবাসীদের সঙ্গে মিলিত হন। সাথে একমাত্র সঙ্গী হযরত আব্বাস (রাঃ)। আকাবা গিরিগুহায় সমবেত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ—

"অবিদিত নহে কথা সর্বত্র প্রচার,
হাশেম বংশের মান জগতে অপার।
সেই বংশে মহাম্মদ জন্ম লইয়া,
উজ্জল করেছে বংশ ধর্ম প্রকাশিয়া।
নিশ্চয় ইসলাম জগতে ছাইবে,
পৃথিবীর কোন অংশ বাকী না রহিবে।।"

মদীনাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে মহানবী বলেন ঃ—

"কিন্তু ভাই এই ধর্ম করিলে গ্রহণ,
ধনমান জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
দারা পুত্র স্বদেশের মায়া পরিহরি
হয়ত হইতে হবে পথের ভিখারী।"

শুধু তাহাই নয়—

"নিত্য নিত্য নব নব বিপদ আসিবে,
অপবাদ ঝঞ্ঝাবাতে ঘিরিয়া বসিবে।"

এবং তখন মদীনাবাসীদিগকে—

"মৃত্যুকে হৃদয় হ'তে করি আলিঙ্গন,
প্রস্তুত থাকিতে হবে সদা সর্বক্ষণ।"

সমস্ত বিপদের কথা জানিয়াও তাহারা বলিয়াছে—"প্রস্তুত হয়েছি মোরা অন্তর বাহিরে।" তাহারা হযরত নবী (সাঃ)-কে মদীনায় আহবান জানাইয়াছেন। তাঁহাকে সর্বোতভাবে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ঃ—

"আপনার দেহ রক্ষা করিবার তরে
আমাদের দেহ ঢাল হবে অকাতরে।"

বস্তুতঃ মদীনার আনসারগণ ওহুদের যুদ্ধে হযরত (সাঃ)-কে রক্ষা করিতে নিজেদের দেহকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) প্রথমে মুসলমানদিগকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে করিয়া মক্কা হইতে হিজরত করেন ঃ—

"খ্রীষ্টের ছয় শত বাইশ সনের
বিশে জুন তারিখের শেষাংশ রাত্রের।
হযরত ছাড়িয়া মক্কা যান মদিনায়,
বাংলা হিসেবে জৈষ্ঠ মাস কহা যায়।"

মদীনায় হযরতের শুভাগমনে সর্বত্র শান্তি বিরাজমান। দীর্ঘ দিনের শত্রুতা গোত্র কলহের অবসান হইয়াছে। কারণ—

"এস্লাম ধর্মের তেজ বড়ই প্রখর,
হিংসা দ্বেষ শত্রু ভাব কিংবা মনান্তর,
ওই তেজে জ্বলে পুড়ে হয় ছাড়খার।"

মদীনায় আসিয়া মহানবী (সাঃ) বিবি আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবি ফাতিমা (রাঃ)-এর পরিণয় দান করেন। এই দুই ঘটনার জন্য এবং মদীনায় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মদীনার গৌরব। ইহাই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যটি ছন্দোময় রচনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মীরের বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থের মত ইহার শিল্প-সুষমা নাই বলিলেই চলে। রচনা-রীতি কখনও কখনও স্থূলতার নামান্তর মাত্র; গতানুগতিক ভাবের প্রাণহীন অবলম্বন মাত্র। রচনা-রীতির শৈথিল্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নমুনা উপরে লক্ষণীয়। হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহ সম্পর্কে রচিত অন্য একটি বর্ণনার ভঙ্গীও খুব রুচিকর নয়। যেমন :—

"আরবের স্বাভাবিক জলবায়ু গুণে
বালিকারা খারা হয় আসিয়া যৌবনে।
তাহাতেও হযরত সাত বছরের
পাত্রীকে বিবাহ করা ভাবিয়া দোষের।
তাই সে সময় বিয়ে হয় না মক্কায়,
কিন্তু কথা স্থির ছিল জানিত সবায়।"

মক্কার বৈরী কাফেরদের বৈঠকে বৃদ্ধবেশী শয়তান বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিতেছে। ইহাও স্থূলতার অন্য একটি নমুনা :—

"এক দেশ আছে ভাই নাম হিন্দুস্থান,
দেবদেবী ভক্ত তারা হিন্দুর সন্তান।

আমার স্বজাতি তারা আমার বংশধর,
উজ্জল করেছে তারা গৌরব দেশের।
হিন্দুস্থানে নানা স্থানে দেব পূজা হয়,
বড় সুশ্রী করে তারা প্রতিমা গড়ায়। ... ...
ছেলে পিলে হয়েছে তব, সে যুবতী,
মন টলে যায় গুলে দেখিলে মুরতি।"

হযরতের আগমনে মদীনায় সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দিন দিন তাহার গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাব্যের শেষে কবি বলেন :-

"মদিনার গৌরব ক্রমেই বাড়িবে,
কত কীর্তি মদিনায় জাগ্রত রহিবে।
সর্বোপরি এক কীর্তি এমন ঘটিবে,
বিশ্বময় সে কীর্তির ঘোষণা ঘোষিবে।
সুষম সুখ্যাতি পুষ্পে বাড়িবে সৌরভ,
চিরকাল স্থায়ী হইবে মদিনার গৌরব।"

ভবিষ্যতে গৌরবের আভাস দিয়া কবি কাব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিবি খোদেজার বিবাহ : সাধ্বী খোদেজা তাহেরা (রাঃ) হযরতের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত। পতি-পরায়ণা এই নারী বিশ্ব নারী সমাজের আদর্শ। হজরতের জীবনের সংকটময় মুহূর্তে এই নারী জোগাইয়াছেন অপূর্ব প্রেরণা, দিয়াছেন অভয়বাণী। বিবাহোত্তর জীবনে তিনি স্বামীর চরণে তাঁহার বিশাল সম্পত্তি এমনকি স্বীয় সেবককে পর্যন্ত নিবেদিত করেন। এইরূপ মহিয়সী নারীর বিবাহ উৎসবের বর্ণনা কবি পুথির ঢংএ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পান। জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়া ধর্ম-চর্চা তথা ধর্মীয় আবেগের সুলভ ও জনপ্রিয় রূপায়নই মীর মানসের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। এখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া গিয়াছেন মিশ্র-ভাষারীতির কাব্যের জগতে-পুথি সাহিত্যের অঙ্গনে। এই অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অচেতন ছিলেন তাহা নয়। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, "সমাজের চৌদ্দ আনা লোকের" অর্থাৎ যাহারা অল্প শিক্ষিত এবং পুথি সাহিত্যের রস

গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের জন্য তিনি এই কাব্য রচনা করেন। কবির শেষ জীবনের সমস্ত রচনাই এই শ্রেণীর পাঠককে মনে করিয়া লেখা। অতএব ভাবে, ভাষায় ও আঙ্গিকে কিছুমাত্র সতর্ক হইবার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন নাই।

'বিবি খোদেজার বিবাহ'—গ্রন্থে বিধবা খোদেজা (রাঃ)-কে যতদূর সম্ভব কুমারী নায়িকার গৌরব দানের চেষ্টা করা হইয়াছে। বিবি খোদেজা তাই বলিতেছেন :—

"বিধবা হয়েছি কবে কিছু মনে নাই,
লোকে বলে ছিল স্বামী আমি দেখি নাই।"

অথচ বিবি খোদেজার পূর্বে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। ইতিহাসের এইরূপ বিকৃতি এই জাতীয় গ্রন্থে বিরল নহে। তৌরাতে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দেহ সৌষ্ঠবেব বর্ণনা আছে- এই কথা তিনি গ্রন্থে বলিয়াছেন এবং হজরতের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন অনেক।

'**মোস্লেম বীরত্ব**—অমর কথা শিল্পী মীর মশাররফ হোসেনের ইহা একটি কাব্য মিশ্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে পূর্ববর্তী পুস্তকের মত একই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বদর, ওহোদ ও খায়বার—এইসব যুদ্ধে মুসলমানেরা যে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন, তাহাই পয়ার ছন্দে কখনও গদ্যে দুই অধ্যায়ে উনিশটি সোপানে বর্ণিত হইয়াছে। ১৩১৪ সালের ২৫শে আষাঢ় তারিখে লিখিত "অগ্রে পাঠ্য"—(ভূমিকায়) লেখক তাহার রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"অনেক বিধর্মীর কলমে, কথায়, প্রকাশ্য বক্তৃতায় প্রকাশ যে মুসলমানেরা এক হস্তে কোরান, অন্য হস্তে কৃপাণ লইয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছে। কি আশ্চর্য জ্ঞান !! কি আশ্চর্য যুক্তি !! মানবকুলের চিত্র ক্ষেত্র হইতে কুসংস্কার বৃক্ষ, লতা, তৃণ, ইত্যাদির মূলোচ্ছেদ করিতে এসলাম ধর্ম তেজপূর্ণ মাত্রায় সকলের চক্ষের উপর জগতে বিরাজ করিতেছে। মহা পবিত্র 'কোরান মজিদ' অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া জন-সমাজে হিত উপদেশ প্রদান করিতেছে। শত শত নাস্তিক, সহস্র সহস্র বিধর্মী বিবেকের তাড়নায় এসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি সুখে মন প্রাণ শীতল করিতেছে। বন্ধুগণ।

এ সকল ঘটনা কোন কৃপানের কার্য ? এসলাম-কৃপান চীন, জাপান, আমেরিকা, লিভারপুল প্রভৃতি স্থানে চাকচিক্য দেখায় নাই। তবে কেন ঐ সকল স্থানে এসলাম ? ... ...শান্তিপ্রিয় মুসলমান কি কারণে তরবারী হস্তে করিয়াছিলেন, বীরত্বের সহিত বিধর্মীদের মুণ্ডপাত করিয়া বিজয় নিশান উড়াইয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেখাইতে 'মোস্লেম বীরত্ব' প্রকাশ পাইল।" বদরের যুদ্ধ হইতে গ্রন্থেটির বর্ণনা শুরু হইয়াছে। আরম্ভ এইরূপ :—

"পুণ্য ভূমি জন্মভূমি হযরত ছাড়িয়া
রয়েছেন মদিনায় পরিজন নিয়া।
এদিকে কোরেশগণ শত্রুতা করিতে,
হয়নি পশ্চাতপদ পারেনি ভুলিতে।
ক্রমে শত্রুতার বৃদ্ধি হিংসার আগুন,
বাড়িতে বাড়িতে হয় পঞ্চদশ গুণ।"

গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক মনোভঙ্গী এবং ইহার অন্তরালবর্তী ধর্মীয় আবেগের প্রশংসা থাকিলেও রচনাটির দুর্বলতার কথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন—

"খৃষ্টের ছয়শত তেইশ সনের
নভেম্বর মাসে এল খবর যুদ্ধের।"

শত্রুর প্রতি হযরতের ক্ষমা প্রদর্শন বার বার প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বইটিতে ব্যক্ত লেখকের মন্তব্য এই যে, বিধর্মীকে ক্ষমা করিয়া লাভ নাই। কারণ সুযোগ পাইলেই তাহারা যন্ত্রণা দিবে।

প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে দশটি সোপান অনুযায়ী বক্তব্য নিম্নরূপ :

প্রথম সোপান—ভূমিকা—কোরেশদের মদিনা আক্রমণ পরিকল্পনা।

দ্বিতীয় সোপান—কোরেশদের অনুমান মিথ্যা নয়—মুসলিমদের শৌর্য-বীর্য ব্যর্থ হয় নাই।

তৃতীয় সোপান—আভ্যন্তরীণ শত্রু ইহুদীদের চক্রান্ত।

চতুর্থ সোপান—আবদুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলুল এর মুনাফীকি, মুসলমানগণ মদিনা রক্ষার জন্য প্রস্তুত।

পঞ্চম সোপান—নভেম্বরে যুদ্ধের খবর দিয়ে শুরু। আবদুল্লাহ নামে সাহাবী কোরেশদের গুপ্ত খবর সংগ্রহে নির্দেশ প্রাপ্ত।

ষষ্ঠ সোপান—গুপ্তচর-মুখের সংবাদ—কোরেশগণ যুদ্ধের জন্য "সংগ্রহ করিল অস্ত্রশস্ত্র অগণন।" সঙ্গে সঙ্গে "এস্লাম গৌরব আর হযরতের প্রাণ" রক্ষার জন্য বহুলোক প্রস্তুত হইল।

সপ্তম সোপান—বদর যুদ্ধের জন্য মক্কাবাসীদের আয়োজন। নারী চরিত্র হিসাবে বীরজায়া হিন্দার পরিচয়। লেখক যেন নারী শক্তির বন্দনা করিয়াছেন এখানে।

অষ্টম সোপান—বদরের যুদ্ধ-শেষের ফলশ্রুতি লাভ যাহা হইল তাহা বিবৃত করিয়া এই সোপান সমাপ্ত। এই যুদ্ধ জয়ের পর মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস প্রবল হইল, তাহারা জানাইল যে—

বলবীর্য ধর্মতেজে একতার বলে,
ঐশ্বরিক শক্তি যেন গুপ্তভাবে খেলে।
সেই শক্তিবল ক্রমে এস্লামের দল,
কালেতে হইবে তারা সর্বত্র প্রবল।

নবম সোপান—এখানে টুকরা খবরাখবর পরিবেশিত হইয়াছে। যেমন নবী-কন্যা রোকেয়ার মৃত্যু, মক্কা হইতে জয়নাবের প্রত্যাবর্তন।

দশম সোপান—কোরেশদের আফসোস আর আক্রোশ এখানে বিবৃত হইয়াছে। হিন্দার প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা ও আক্রোশই যেন এই সোপানের বিষয়বস্তু। 'খাদ্যদ্রব্য থলিফেলা' যুদ্ধ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি আরম্ভ হইয়াছে ওহোদের যুদ্ধ বিবরণ দিয়া। প্রথম সোপান—ইহুদীদের ক্ষোভ ও মনোদুঃখ। "বড় দুর্দান্ত তারা সুবিখ্যাত খল" স্বরূপ ইহুদী গোত্রের নানা ছল-চাতুরীর কথা বর্ণিত হইয়াছে এই সোপানে। দ্বিতীয় সোপানটি ঘরোয়া কথায় পরিপূর্ণ। ইমাম হাসানের জন্ম সংবাদ দিয়া এই সোপান সমাপ্ত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ সোপানে রহিয়াছে ওহোদ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা। পঞ্চম সোপানে সামাজিক ব্যবস্থার কিছু

পরিচয় আছে। ইহাতে আরও আছে ইহুদীদের ছলনা ও কিছু খন্ড যুদ্ধের কথা। পরবর্তী সোপানে ইহুদীদের "নগর ছেড়ে চলে যাক" এর বর্ণনা। সপ্তম সোপানে খবর হইল ঃ—

পরিখা খনন কার্য্য প্রথম ধরায়,
হইল আরব হতে হজরত কৃপায়।

পরিখার যুদ্ধ ও যুদ্ধকালে বানি কুরায়জা নামক ইহুদী গোত্রের সন্ধি শর্ত ভংগের ঘটনাসহ আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে এই সোপানে। পরবর্তী সোপানগুলিতে হুদায়বিয়ার ঘটনাসহ হযরতের জীবনের অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা করে লেখক মদীনায় প্রতিষ্ঠিত শান্তিময় স্বর্গরাজ্যের অধিকর্তার কিছু মহিমা বিবৃত করিয়াছেন।

এসলামের জয়—ইহা একটি আবেগ প্রধান রচনা। ইসলামের পট-ভূমিকায় রচিত এই চমৎকার গ্রন্থটি মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ব করিবার জন্য ইসলামের একজন ভক্ত হৃদয়ের সুলিখিত পুস্তক। ইহার ভাষা অত্যন্ত বেগবান ও কাব্যধর্মী। ইহা মিশ্র ভাষায় রচিত। ইহা ইতিহাস নয় বা উপন্যাসও নয়। গ্রন্থটির যুক্তিতর্ক জোরালো, তত্ত্ব ও তথ্যাংশ সমৃদ্ধ। রচনাংশ বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল। কিন্তু বর্ণনা ভঙ্গীর মধ্যে একটি মৃন্ময় রূপ কল্পনাবর্ণিত বিষয়কে এমনভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে যেন লেখকের একটি ব্যক্তি পুরুষ তাঁহার আন্তরিকতার ও ব্যক্তিমানসিকতার রঙে রঞ্জিত হইয়া সমগ্র গ্রন্থেই ব্যাপৃত রহিয়াছে। তদোপরি রহিয়াছে ঘটনা ব্যপদেশে চরিত্র চিত্রনোপযোগী ঔপন্যাসিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী শক্তির প্রকাশ।

পুস্তকটি সম্পর্কে ডঃ আনিসুজ্জামান বলেন—ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইলেও "এসলামের জয়"তে কল্পনার স্থান অনেকখানি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে বর্ণাঢ্য বর্ণনা, কাল্পনিক সংলাপ ও চিত্রকল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে দৃশ্যমান। প্রসঙ্গতঃ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গ্রন্থকার তদীয় স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছাসময় আত্মগত উক্তি সংকলন করিয়াছেন। মদীনায় অবস্থানকালে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা ইহার 'প্রথম শাখা'য় দশটি 'মুকুলে' গ্রথিত হইয়াছে। 'দ্বিতীয়

শাখা'র তেরটি 'মুকুলে' বিবৃত হইয়াছে মক্কা বিজয় ও তাহার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ। বইটিতে গ্রন্থকার মন্থর ও সুবিস্তৃত বর্ণনার সাহায্যে শ্লথ ঘটনাবলীকে একত্র করিয়াছেন ভাষার রীতিমত সাফল্যের আবেগময়তায়।

মৌলুদ শরীফ—মীর সাহেবের এই গ্রন্থটি ছন্দোবদ্ধ পয়ারে ও গদ্যে রচিত। উর্দু সাহিত্যে মিলাদ সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। (ইদানিং বাংলা ভাষায়ও অনেক মিলাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।) সম্ভবতঃ উর্দু মিলাদ সাহিত্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থটিতে মীর সাহেবের মৌলিক রচনার সঙ্গে আরবী ও উর্দু হইতে অনূদিত অনেক অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে মহানবী (সাঃ)-এর মে'রাজের রাত্রিকালীন প্রকৃতির বর্ণনা মীরের রচনায় নিম্নরূপ ধরা পড়িয়াছে।

দ্বিযাম অতীত নিশি, রজবের সাতাইশে।
আরব গগন শোভা, বাড়িয়াছে এত কিসে ?
চন্দ্র নাই আকাশেতে, শুধু তারাদল ভাসে।
কত গ্রহ-উপগ্রহ— জ্বলন্ত জ্যোতি বিকাশে।।
ক্রমে রজনীর সনে, বাড়িয়াছে অম্বর শোভা।
অনন্ত হীরার হারে— বিভাসিছে যেন প্রভা।।
কাহার কিরণ ছটা— পড়িতেছে উতরিয়া।
ডগমগ করে যেন, কে পড়িছে খসিয়া।।
খেলায় বিজলী ছটা, দমকে দমকে কেহ।
মুচকে মুচকে হেসে - মিটি মিটি চায় কেহ।।
ঘন ঘন ঘনঘটা, আরব আকাশে নাই।
নিশি শোভা মনলোভা, হইয়াছে এত তাই।।
লোহিত হরিত ছটা, মাঝে মাঝে ক্ষরিতেছে।
হরষে ফাটিয়া যেন, কত তারা খসিতেছে।।
অশ্বিনী ভরণী আর, রোহিনী কাত্তিকা দল।
হাসি হাসি খসি যেন— পরশিছে ধরাতল।।

টঙ্কারিয়ে ধনু ধনু, অভ্যর্থনা করিতেছে।
বিপাশা পাশেতে থেকে, উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে।।
হরষে সরষে স্বাতী, বিতরিছে জলকণা।
মে'রাজের নিশি আজি, রসুলের অভ্যর্থনা।।
অদৃষ্ট চক্রের চাকা, ঘুরুক যেদিক যথা।
অবিরত ধারে বারি, পড়িতেছে যথাতথা।।
ক্ষুদ্রকায় অরুন্ধতী— কেহ দেখে নাহি দেখে।
ঘোমটা খুলিয়া আজি— দেখাইছে সব লোকে।।
চির স্থির ধীর ধ্রুব— উত্তরের পরিচয়।
সেও সুক্ষ্মভাবে আজি, সবে কল্পনায় কয়।।
মহানন্দে ঘুরিতেছে— সপ্তর্ষিরা চক্রাকারে।
বেড়িয়া ধ্রুবে যথা, পরমেশ্বর সমাদরে।।
আকাশের আদম ছবি, যেন হাতপাও তুলি।
নাচিছে শূন্যের পরে, হীরকের বাজরা খুলি।।
মে'রাজের নিশি আজি, প্রকৃতি বুঝিয়া আগে।
ধরিয়াছে স্থির ভাব, ভক্তি-প্রেম অনুরাগে।।
নড়ে না চড়ে না পাতা, ঝরে না শিশির কণা।
জীবজন্তু প্রাণী যত ছাড়িয়াছে আনাগোনা।।
স্বভাবের গতি ধ্বনি, নিশিতে যা লাগে কানে।
নিয়েছে হরিয়ে কেহ— যেন অতি সাবধানে।।

—(মে'রাজের নিশি)

ছহিবত্ রহমতে আলম বা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ' এর জীবন কথা—ঢাকাস্থ ইসলামিক একাডেমী কর্তৃক ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ২১৪ পৃষ্ঠার এই পুথিটি মহানবী (সাঃ)-এর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধ জীবনী। প্রচলিত পুথির ন্যায় ডান দিক হইতে শুরু না হইয়া বাংলা পুস্তকের মত বাম হইতে ডানে ইহার পঠন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অতি সত্য যে পুথি সাহিত্যে শেষ নবীর জীবনকথা ও বাণী সমধিক প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ

স্থানেই কাল্পনিক ও প্রক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু আসিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ জীবনীকে ম্লান করিয়াছে। ফলে বাংলার আপামর জনসাধারণ, যাহারা পুঁথির স্বাদ গ্রহণে অধিক আগ্রহী, তাহাদের নিকট প্রিয় নবীর খাঁটি জীবনী রহিয়াছে রহস্যাবৃত। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া একাডেমী মহানবীর বিশুদ্ধ জীবনী পুঁথির ভাষায় প্রকাশ করিবার মহতী ব্রত পালন করেন। পুঁথিটির ভূমিকায় 'প্রকাশকের কথা' পড়িলেও তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। যেমনঃ "বাংলা জবান যাঁহাদের মুখের জবান তাঁহাদের প্রায় শতকরা নব্বই জন এখনো গ্রামে বাস করেন। তাঁহারা যে ভাষা বলেন ও বোঝেন তাহা আধুনিক সংস্কৃত ভারাক্রান্ত বাংলা সাহিত্যের নকল ভাষা নহে। এ কারণে এই ভাষায় রসুলে করীমের যেসব মূল্যবান জীবনী লেখা হইয়াছে সেগুলি তাঁহারা পড়িবার সুযোগ পান না। তাঁহারা যে সাহিত্যের সহিত পরিচিত তাহা হইতেছে পুঁথি সাহিত্য। কিন্তু পুঁথি সাহিত্যে নবী করীমের (দঃ) জীবনীর উপর যেসব পুঁথি আছে সেগুলিতে ইতিহাসের সত্যের চাইতে কল্পনার ভাগ অনেক বেশী। এজন্যে এসব পুঁথিতে এমন সব গাজাখুরী কাহিনীর সমাবেশ দেখা যায় যাহার সাথে রসুল করীমের (দঃ) জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে যে এদেশের কোটি কোটি মুসলমান রসুলের জীবন কথা জানেন না, অথচ আমরা তাঁহারই উম্মত, তাঁহারই অনুসারী।"

পল্লী বাংলার কোটি কোটি মুসলমানকে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা ও ইতিহাসের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য একাডেমী পুঁথির ভাষায় রসুলে করীমের জীবনী ও ইসলামের প্রামান্য ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা করেন। 'ছহিবড় রহমতে আলম' সেই পরিকল্পনার প্রথম পুঁথি। নির্ভরযোগ্য জীবনী পুস্তকসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া পুঁথিটির একটি কাঠামো দাঁড় করান জনাব কাজী আবুল হোসেন। তিনি একাডেমীর নির্দেশ মোতাবেক যে কাঠামোটি তৈয়ার করেন তাহা পড়ে একটি সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক পর্যালোচিত, পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন মরহুম কবি ফররুখ আহমদ, কবি তালিম হোসেন, ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ এবং সুসাহিত্যিক শাহেদ আলী। তাঁহারা পুঁথিটির ঐতিহাসিক দিক, ইহার ভাষা, ছন্দ রূপকল্প এবং কাব্যরীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তোলেন।

একাডেমীর পক্ষে ইহার প্রকাশক জনাব শাহেদ আলী বলেন : "এই পুথিতে রসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) মুখতেছর জীবনী এবং তাঁহার শিক্ষা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই পুথি যাঁহারা পড়িবেন ও শুনিবেন তাঁহারা রসূলুল্লাহর জীবনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় নবীকে চিনিবেন। নবীর উম্মত হইয়া যদি নবীকে না চিনিলাম তো আমাদের জীবনই বৃথা। আমরা আশা করি, এই পুথি আমাদের পল্লীবাসী ভাইদের ঘরে ঘরে স্থান পাইবে।"

একাডেমী (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন) এর উদ্দেশ্য কতটা সফল হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। কারণ, বাংলা ভাষার উন্নয়নে ও বাঙালী পাঠকের সাহিত্যিক রস পিপাসা নিবৃত্তির জন্য গ্রন্থের ভাষা, ছন্দ ও কাব্যগুণ, যে অনুকূল নয় তাহা বুঝিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। সংস্কৃত ভারাক্রান্ত বাংলা যেমন বাংলাভাষার প্রকৃত রস সমৃদ্ধির উপযোগী নয় তেমনই বাঙালী মুসলমান যে ভাষা বলেন ও বোঝেন তাহার আদর্শও 'রহমতে আলম' এর ভাষায় পুরাপুরি ব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং দেখা যায় যে 'রহমতে আলম' পুথিতে এমন সব ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে যে ভাষাতে এই দেশের মানুষ কথা বলেন না বা সে ভাষা তাহারা বোঝেন না। একটি অংশ লক্ষ্য করা যায় :

রহিম রহমান আপে জলিল জব্বার।
তামাম জাহান জারী ছেফত তোমার।।
খাকী বাদী যাহা কিছু তোমারই সৃজন।
আপন কুদরতে সব করিছ পালন।।
হায়ওয়ানাত, নবাতাত আর জমাদাত।
সৃজিয়াছ দুনিয়াতে সবে ভাতে ভাত।।
সবার রিজিক তুমি কইরা মুকারার।
নিয়াছ রাজ্জাক নাম আপে পরোয়ার।।
তামাম জাহানে তেরা কানুন ছাবুদ।
তুমি বিনা দুজাহানে নাহিক মাবুদ।।

উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। এখানে অনেক শব্দই দেশবাসীর 'মুখের জবান' নয়। এইরূপ ভাষাতে ৬৭টি অধ্যায়ে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের

প্রায় প্রতিটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে এই পুঁথিটিতে। সমসাময়িক কালে রচিত এইরূপ আরও কিছু কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও মহানবীর জীবন কথার বহুল প্রচার সম্ভব হয় নাই কিংবা বাংলা ভাষা সাহিত্যেরও বিশেষ কোন কল্যাণ হয় নাই।

তবে চিরাচরিত প্রথা হিসাবে কাব্যটি 'হামদ' ও 'নাত' এর মাধ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। 'নাত' এর অংশটি এইরূপ :

"নূরের মশাল হাতে, আইলা নবী দুনিয়াতে,
বদকাম হৈয়া গেল দূর।
দুনিয়া উজালা হৈল, শয়তান ভাগিয়া গেল,
চারিদিকে চমকিল নূর।।
ঝুটা বদকারি যত, একে একে হৈল গত,
নেকির জামানা আইল ভাই।
রসুল হৈলেন হাদী, পিছনে কাতার বাঁধি,
আগে বাড়ে দীনের সিপাই।
ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, রাহাজানি কাড়াকাড়ি,
সুদ ঘুষ হইল যে দূর।
যা কিছু আন্ধেরা ছিল, নূরেতে উজালা হইল,
হক নাম হৈল মাশুর।।"

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও সন্ধি প্রথমতঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে হইয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু পরে সকলেই জানিতে পারেন যে, এই সন্ধির ফলে কাফের ও মুসলিমের মধ্যে এতদিনের ভুল বুঝাবুঝি ও ঘোর শত্রুতার ভাব কাটিয়া পড়িল। ফলে অদূর ভবিষ্যতে মক্কা বিজয়ের পথ প্রশস্ত হইল। এই সোলের শর্তগুলি পুঁথির ভাষায় নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"ভেজিল কাসেদ এক নবীর বরাবর।
সোলেয় শরত্ এক করিয়া তৈয়ার।।
পহেলা শরত্ এই শোন মেহেরবান।
ফিরিয়া যাইবে এবে যত মুসলমান।।

আসিবে আয়েন্দা সালে হজ্জের লাগিয়া।
তিন রোজ গুজারিবে মক্কাতে আসিয়া।।
ইহা বাদে মদিনাতে ফিরিয়া যাইবে।
দশ সাল তক নাহি লড়াই হইবে।।
দোসরা শরত্ এই শোন বেরাদর।।
মুসলমান না আনিবে কোন হাতিয়ার।।
খাপেতে রহিবে ঢাকা সে সব সামান্।
তেশরা শরত্ এই যবে মুসলমান।
ওমরা করিয়া যাবে আপনা মকান।।
যত মুসলমান আছে বাসিন্দা মক্কায়।
সাথে না লইবে কারে ফিরার সময়।
চওথা শরত এই শোন মুসলমান।
মক্কার কোরেশ কেহ আনিয়া ঈমান।।
ভাগিলে মদিনা তারে ভেজিবে মক্কায়।
লেকিন মুসলিম কভু মদিনা হইতে।
মক্কায় ভাগিলে তারে ফিরাইয়া দিতে।।
কোরেশের পরে নাহি লাজিম হইবে।
এই শরত্ দো তরফে বহাল থাকিবে।।
পাঁচওা শরত্ এই আরব দেশেতে।
যতেক কওম আছে তাহাদের সাথে।।
যে যাহার খুশীমত করিবে ব্যাভার।
দোন পক্ষে রহিল সোলের এখতিয়ার।।"

মহানবী (সাঃ)-এর 'আখলাকের বয়ান' হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়া এই পুস্তকের আলোচনা সমাপ্ত হইল। যেমন ঃ—

"ধীরে কথা বলিতেন নবী দোজাহান।
পষ্ট আর ছাফ লফজ শুনহ ইনসান।।
কথা নাহি কহিতেন নবী অকারণে।
খুশী হইলে হাসি তাঁর ফুটিত বয়ানে।।

দ্বীন লইয়া বাড়াবাড়ি করিতে রসুল।
করিলেন মানা এতে না হয় ওসুল।।... ...
দোসরাতে কম কথা কহিবে জবানে।
রহিবে খামুস যত পার সবখানে।।...
দুধ, মধু, ফুল, ফল সুর্মা ও আতর।
ভেজিলেন যাহা রব দুনিয়ার পর।।
সেই সব নেয়ামত, শিরিন হুশদ।
ভাসিতেন বড় ভাল আপে হজরত।।... ...
বিবি আয়শায় এক শখ্‌স একদিন।
এই কথা পুছিলা উম্মুল মুমিনীন।।
নবীজির আখলাক আছিল কেমন।
শুনিয়া সওয়াল আম্মা আয়েশা তখন।।
জওয়াবেতে এই কথা কন মুখতাছার।
তোমরা পড় নাই কালাম আল্লার।।
জিন্দেগানি ছিল জানি আখেরী নবীর।
এহি পাক কোরআনের আসল তফসির।।"

হযরত নবী করীম (সাঃ) ছোটদিগকে খুবই ভালবাসিতেন এবং বড়দের সম্মান করিতেন। পুথিকার বলেন—

"ছোট বাচ্চাদের নবী বাসিতেন ভাল।
আছিল যেমন তারা নয়নের আলো।।
মৌসুমের ফল নবী না খাইয়া নিজে।
দিতেন তকসিম করি তাহাদের বিচে।।
খোঁজ লইতেন নবী তাহা সবাকার।
সালাম দিতেন নিজে শুন সমাচার।।
এই কথা বলিলেন আপে হযরত।
বাচ্চাদের যারা নাহি করে মুহব্বত।।
ইজ্জত না করে আর বুযর্গের যারা।
বেশক মোদের নহে জানিবে তাহারা।।"

ইসলামের মহান নবীর মত জ্ঞান অর্জনে এত জোর আর কেহ দেন নাই। বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন ধর্মেও এইরূপ তাগিদ নাই। কিন্তু—

"ইলমের তরে নবী দিলা বড় জোর।
আওরত মর্দের এতে না রহে ওজর।।
ইলেম তলব করা হয় যে ফরজ।
ইলেমে মকসুদ আর পুরে যে গরজ।।
এত্তা জোর দেন নবী ইলেমের তরে।
কেহ না করিল যায়ছা দুনিয়া ভিতরে।।
বলেন হাবিবে খোদা এই বাতে।
দানা লোগ যে কালিতে লেখেন তাহাতে।।
শহীদের খুন হৈতে হয় যে বেহতের।
আল্লার রসুলে কন এই বাতে ফের।।
ইলেমের লাগি যদি জরুরাত হয়।
দূর চীন মুল্লুকেও যাইবে নিশ্চয়।।"

মহানবী (সাঃ) এর আখলাক বা চরিত্র সর্বকালের, সর্বজনের আদর্শ। তাঁহার জীবন-কথা প্রত্যেকের অনুসরণীয়। তাঁহার প্রতিটি কাজই মানুষের ইহ-পরকালের জীবনে কল্যাণ ডাকিয়া আনে, কারণ তাঁহার চরিত্র যে 'উসওয়াতুল হাসানা।'

'খাতামুন নবীঈন'—পল্লীকবি রওশন ইজদানী (১৯১৭-৬৭ ঈঃ) রচিত এই পুস্তকটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। এই ব্যতিক্রমধর্মী কাব্য-গ্রন্থটি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও একক সাহিত্য কীর্তি। তিনশত নিরানব্বই পৃষ্ঠায় এবং নবম মনজিলে (পরিচ্ছেদে) সমাপ্ত এই কাব্যখানিতে হযরত রসুলে করীমের জীবনী গ্রাম্য বাংলা জবানীতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৯৬০ সালে গ্রন্থটি প্রথম আদমজী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করে। ইতঃপূর্বে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে ধারাবাহিকভাবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রাম্য লোক-গীতিকার চটুল ছন্দে সংরচিত গ্রন্থটি বিশ্বনবীর বিরাট ও বিচিত্র জীবন মাহাত্মের গম্ভীর ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ। এইরূপ ছন্দে এতবড় জীবনী সংরচন

সত্যই দুঃসাধ্য। কিন্তু রওশন ইজদানী লোক কাব্যের বাকরীতিকে আধুনিক জীবন সমস্যার প্রকাশ মাধ্যম বা শিল্প চেতনার অভিব্যক্তিরূপে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার কাব্যে আটপৌরে ও অশালীন শব্দ এবং বাক্যরাজি স্বাভাবিকভাবেই স্থান করিয়া লইয়াছে; স্বভাব কবির চরিত্রই এই সকল ক্ষেত্রে মাথা উচাইয়া উঠিয়াছে। মহানবীর জীবন-ভিত্তিক এই কাব্যে শুধু যে লোকজ ধ্যান-ধারণাই রূপ লাভ করিয়াছে তাহাই নয়, পুঁথি-কাহিনীর আঙ্গিকে সংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তিবাদী হৃদয়ের স্বরূপও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন—

"আধেক ঘুমে মা আমিনা দেখিলেন স্বপন
আসার সময় হইয়াছে তাঁর অঞ্চলেরো ধন।
একলা ঘরে মা আমেনা শুইয়াছিলেন রাত
আচম্বিত আইলো কয়েক আনচিনা আওরাত—
সাদা লেবাছ, সাদা পিরণ অঙ্গভরা বাস
খেদমতে তার আইলো তারা, মুখে মধুর হাস।
খেদমতে তার আইলো তারা মা আমেনার ঘর
তাদের রূপে রাতের আন্ধি হইয়া গেলো ফর।"

এইরূপ লাস্যময়ী চটুল ছড়া-ছন্দে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর সংগ্রামময় বিরাট মহান জীবন কাহিনী রচিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের রসবোধ ক্লিষ্ট হয়। 'খাতামুন নবীঈন' সুগম্ভীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হইলেই তাহার মাহাত্ম্য রক্ষিত হইত। যাহাই হউক, কবি মহামানবের অসাধারণ চরিত্রকে আমাদের গ্রাম্য লৌকিক জীবন সীমানায় স্থাপন করিয়া বাংলাদেশের আলো-বাতাসে দেখিতে প্রয়াসী। কাব্যটির প্রথমে 'আরজ' এ কবি বলেন, "এ পল্লী ভাষায় পল্লী মাটির প্রাণের সুরে বিরচিত নবীজীর জীবন কাব্য।------বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। অথচ বাংলা ভাষায় হযরত রসুলুল্লাহর (দঃ) জীবনী গ্রন্থ খানকয়েক মাত্র আঙ্গুলে গোণা। দুঃখের বিষয়—সমাজ আমাদের অশিক্ষিত, শতকরা পঁচাশিজন নিরক্ষর। আবার এই শিক্ষিত পনেরো জনের সকলে সুধী সাহিত্যের রসাস্বাদ গ্রহণের মত ক্ষমতার অধিকারী নন। কিন্তু সুখের বিষয়—সমাজ আমাদের যত

অশিক্ষিতই হোক, তাদের মন মুর্দা নয়, জ্ঞান লিপ্সা কম নয়—অবসর বিনোদনে তাহারা এখনও একক স্বতন্ত্র সাহিত্য চর্চা করে; তাই দেখি এখনও গাঁয়ে পুঁথি পাঠের আসর জমে, একজনে কোন রকমে গলা টেনে টেনে 'শহীদে কারবালা' বা 'কাছাছুল আম্বিয়া' সুর করে পাঠ করে, আর চারপাশে সাক্ষর-নিরক্ষর সকলে ঘিরে বসে কান পেতে শুনে। এই সমাজের সামনে পরিবেশন করার ইচ্ছা নিয়েই আমি রচনা করেছি সহজ সাবলিল মাটির সুরে—মাটির মুখের ভাষা নিয়ে খাতামুন নবীঈন।" তাই 'খাতামুন নবীঈন'-এর ভাষা হালকা, উপমা রূপক, বর্ণনাভঙ্গি সকলই গ্রাম্য।"

প্রচলিত নিয়মানুসারে 'হামদ' ও 'নাত'-এর মাধ্যমে পুস্তকের আরম্ভ। হযরতের জন্মের পূর্বেকার আরব 'জাহেলিয়াতের আমল' সম্বন্ধে কবি বলেন—

> "আছমানে নাই চান ছেতারা, সুরুজে নাই ফর,
> মক্কাতে নাই আল্লা নবী আছে আল্লার ঘর।
> মক্কাতে নাই আল্লা-নবী—নাই আল্লার নাম,
> সারাদেশে বিরাজ করে পাপের জাহান্নাম।
> খোদার ঘরে, ঘরে ঘরে বিরাজ করে বুত,
> এদের মানে দেবতা-খোদা দেশের সকল গুৎ।"

অতঃপর আখেরী নবীর আগমনের গুজব তথা তাঁহার পাক পয়দায়েস হইতে, 'শিশু নবীকে লইয়া দাই মা হালিমার গৃহে যাত্রা' পর্যন্ত প্রথম মনজিলের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মনজিলে স্থান পাইয়াছে 'হালিমার গৃহে শিশু নবী', ছিনাচাক, মা আমেনার মৃত্যু, দাদার ইন্তেকাল এবং বাণিজ্য হইতে আবু তালিবের ভ্রাতুষ্পুত্রসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন। দাদার মৃতুতে 'বালক নবীর বিলাপ' কবির তুলিকায় বাণীরূপ নিয়াছে নিম্নরূপে—

> "আজুতনে হায় দাদুজান কোথায় তুমি গেলা—
> আজুতনে কারে লইয়া করব আমি খেলা গো।।
> আজুতনে কে আর মোরে ডাকবো 'দাদুজান'
> কোলে লইয়া কইবো কে আর দাদু 'সোনার চান' গো।।"

এইরূপে—

"কানতে কানতে বালক নবী জার জার হইয়া যান—
সবাই কান্দে তাঁর কান্দনে ঝুরিয়া পাষাণ গো।।"

আজ বালক নবী চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে। তিনি হাসেন, খেলেন, মেষের পাল লইয়া যান ময়দানে। সেখানে একদিন তাঁহার দ্বিতীয় ছিনাচাক হয়। একদিন কিশোর নবী চাচার সঙ্গে বাণিজ্যে যাত্রা করেন বিদেশে। পথে প্রাচীন সামুদ জাতির এলাকায় তাহাদের ধ্বংসের চিহ্ন দেখিতে পান। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ও প্রধানতম আল্লাহদ্রোহী জাতির বা ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষ মানব জাতির শিক্ষার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। কিশোর নবী চাচাকে প্রশ্ন করেন—

"নাই কেন্ এথায় পুষ্প বিরিখ—ফলফলান্তিলেশ,
নাই কেন্ এক কাতরা পানি—এ কোন্ আজব দেশ ?
আবু তালিব বলেন এথায়—ছিলো সামুদজাত
কইর‍্যা খোদার নাফরমানী সব গেছে নিপাত।
কিশোর নবীর কোমল প্রাণে বাজলো এদের শোক,
পাপের কেমন পরিণতি—দেখেন নিজের চোখ।"

তৃতীয় মনজিলে রয়েছে ওকাজ মেলার কুকীর্তি, হযরতের "হলফুল ফজল" নামে শান্তি কমিটি গঠন, তাঁহার 'আমিন' খেতাব লাভ, বিবি খাদীজার বাণিজ্য তদারক, তাঁহাদের বিবাহ, কাবার সংস্কার এবং হযরতের সন্তান লাভ ও জায়েদকে পুত্ররূপে গ্রহণ।

আমাদের 'বিয়া বাড়ী'র কন্যা সাজনের ন্যায় "বিবি খাদীজার কইনা সাজন" কবি গ্রাম্য কবিতার সুরে গাঁথিয়াছেন, যেমন—

ঝুম-ঝুম-ঝুমে বিয়াবাড়ী রাত্রি হইলো ভার
আন্দরেতে পড়লো সাড়া কইনা সাজাইবার ;……
এবং
হইল সাজন, কইনা যেমন সাজলো তরুণ পুড়ী
অঙ্গে জ্বলে রূপের বাহার ভুবনে নাই জুড়ী—

সত্য প্রকাশের মধ্য দিয়া শুরু হইয়াছে চতুর্থ মনজিলের সংরচনা। অন্যান্য বিশিষ্ট ঘটনাও এই পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হইয়াছে. যেমন তৃতীয় ছিনাচাক ও মুহরে নবুওত লাভ, ইসলাম প্রচারের প্রথম নির্দেশ, প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েক-জনের ধর্ম গ্রহণ, প্রকাশ্য প্রচার, কাফেরদের অত্যাচার, আবিসিনিয়ায় হিজরত, এক ঘরে মুহাম্মদ, চাচা আবু তালেব ও বিবি খাদিজার ইন্তেকাল, রসুলের তায়েফ গমন ও প্রত্যাবর্তন এবং বিবি আয়েশার বিবাহ।

হজরতের নবুওত প্রাপ্তির পয়লা ছবক কবির ভাষায় এইরূপে ধরা দিয়াছে। গারে হেরায় মহানবী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তিনবার অদৃশ্য হইতে কে যেন 'হে মুহাম্মদ' বলিয়া সম্বোধন করে। অবশেষে ঃ—

"আচম্বিতে সামনে খাড়া—সে এক নূরের বেশ,
নূরের পুরুষ নূরের লেবাছ– মাথায় নূরের কেশ।
সবজা তাঁহার অঙ্গলেবাছ, মাথায় নূরের তাজ,
হাতে চিকন রেশমী রুমাল– জওহেরাতের কাজ।
হাইস্যা বলেন জ্যোতির পুরুষ -'মুহম্মদ ছালাম'।
আপনাকে আজ খোশ খবরী শোনেন পাক কালাম।
আপনী নবী এই জমানার, আমি জিব্রাঈল।
পড়ুন 'ইকরা বিসমি' বারেক খুলুক মনের খিল।"

ইসলাম ধর্মের প্রকাশ্য প্রচার করিবার জন্য হজরত নবী (সাঃ) বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তায়েফ গমন করেন এবং

"আল্লা মানো কোরান মানো মানো তাঁহার দীন
মানো রসুল মুহম্মদে—দীন কর একীন।"

বলিয়া মানুষকে মূর্তি পূজা হইতে অদ্বিতীয় আল্লার দিকে আহবান করেন। তায়েফের কোন মানুষ তাঁহার বাণী শ্রবণ করে নাই এবং

"লাগলো সবাই দলে দলে দীনের নবীর পাছ
ছুইড়্যা মারে ইট বা পাথর যার যা মিলে কাছ।"

তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া যায়। জায়েদ তাঁহাকে কোন প্রকারে শহরের বাহিরে এক খুর্মা বাগানে নিয়া যান। সেখানে হযরত সুস্থির হইয়া—

"অজু করিয়া দীনের নবী নামাজ পড়ি শেষ
হাত উঠা'য়া খোদার কাছে করেন আরজ পেশ :-
রহম কর হে রহমান তায়েফবাসীর পর
বুঝেনা তাই করছে এরা কাজ এই গুরুতর,
নেয় নাই ওরা তোমার বাণী এদেরতো নাই দোষ,
আমারি তায় সকল ত্রুটি এদের কর খোশ।"

দয়াল নবী (সাঃ) তায়েফবাসীর জন্য আল্লার রহমত প্রার্থনা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

পঞ্চম মনজিলে মে'রাজের বিপ্লবাত্মক ঘটনা ও আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়আত বর্ণিত হইয়াছে। পবিত্র মে'রাজ যাত্রাপথে আছমানের প্রথম স্তবকে পেঁৗছিলে হযরতকে ফেরেশতাগণ খোশ আমদেদ জানায় আর বিশ্বের প্রথম মানব আদম ছফী খুশীমনে গাহিতে থাকেন—

মুবারক হো ইয়া মোহাম্মদ বংশেরো গৌরব
মারহাবা ছাদ মারহাবা ইয়া সৃষ্টিরো আজব, ইত্যাদি

পরকালের বিচিত্র ও নূতন জগত পরিক্রমা করতঃ নবীবর (সাঃ) নশ্বর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলেন। আর—

"এই মেরাজে দীনের গাছে ধরলো নতুন সাজ
এই মেরাজে হইলো ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।
এই মেরাজে হইলো অনেক হুকুম নতুনতর,
অনেক কিছু জাহির বাতিন হইলো জান্-খবর—"

পুস্তকের ষষ্ঠ মন্‌জিলে বর্ণিত হইয়াছে হজরতের মদীনায় হিজরত, মসজিদুন্নবী প্রতিষ্ঠা এবং আজান প্রথা প্রবর্তন। সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে বদর, ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধ, রোকেয়ার ইন্তেকাল, আয়েশা বিবির নামে অপবাদ, শোরাবিলের নৃশংসতা ইত্যাদি ঘটনাবলী। অষ্টম বিভাগে লিখিত হইয়াছে হোদায়বিয়ার সন্ধি, জংগে খয়বর, মুলতবী হজ্জ, মহাবীর খালেদের ইসলাম গ্রহণ, মক্কা বিজয়, হোনাইন, তায়েফ ও তাবুক অভিযান, বিবিধ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ, মুতা অভিযান এবং শেষ নবীর শেষ হজ্জ।

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াছ 'মা'আন' দেশের নরপতি ফারওয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয় এবং মদীনা আক্রমন করিতে প্রস্তুতি চালায়। তাই রসুলুল্লাহ (সাঃ) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী জায়েদের অধিনায়কত্বে মুতার দিকে প্রেরণ করেন। বাহিনী যাত্রাকালে নবী (সাঃ) তাহাদিগকে উপদেশ দেন :—

'যাত্রাকালে নবী বলেন—শোন মুসলমান,
সবসময়ে রাখবে সাবুদ আল্লাতে ঈমান,
কইরো না সে কাতল কভু নারী বুড়া ছাও
তুইলো না সে অসি কভু ফকির সাধুর গাও।
জালাওনা কখন কভু—কাহার বাড়ীঘর
করিওনা নষ্ট কভু ফসল ক্ষেতের পর।
সবার শেষে বলেন নবী আবার সবাই শোন্ :
খোদা নাখাস্তা এই জায়েদের ঘটলে বিপদ কোন।
হইবে সালার জাফর তবে—সকল দলের পতি
তার অভাবে আবদুল্লা বিন রওহা সেনাপতি।
সেও যদি হয় শহীদ তবে কইরো সবাই মত—
ত্বরিৎ জনেক বাইছ্যা নিও তার হাতে বয়েৎ"।

আল্লাহর নবীর কথা মিথ্যা হয় না। এই তিন জন সেনাপতির মৃত্যুর পর খালেদ বিন অলিদ (রাঃ) মুসলমানদের অধিপতি হন এবং যুদ্ধ জয় করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহাকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। আর এই 'আল্লার অসি' চিরদিনই আল্লাদ্রোহিতা, অন্যায়-অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে চালিত হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদে মহানবীর মহাপ্রয়াণ, মা ফাতেমার শোক, ছাহাবীদের শোক নাতে রসুল এবং হুলিয়ানামা রহিয়াছে। গ্রন্থের শেষে—লেখকের শেষ আরজও সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'হুলিয়া নামা' কবির মানসপটে নিম্নরূপে ধরা পড়িয়াছে। সামান্য উদ্ধৃতি দেখুন :—

"কি যে সুন্দর, কি চেহারা কি যে নূরী ঝইল,
চান্দে তবু ময়লা আছে—এই চান্দে নাই মইল,

কি যে মোহন মিষ্টি মধুর, কি যে তাহার মায়া,
শিশির ধোয়া ফুট্টা সে ফুল কাঞা সোনার কায়া।
সোনার বরণ সোনার তনু—সোনায় মানে হার
তাহার রূপের আওলে ছিল অসীম রূপ ভাণ্ডার।
এই চেহারার বিশিষ্টতা করতে বাখান তাই
ফিরিশ্তা কি জীন-ইনছানের সাধ্য মোটে নাই।"

'খাতামুন নবীঈন' কাব্যটিতে ব্যবহৃত শব্দমালা গ্রামীণ রূপে নিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আরব মরুভূমিতে কবি বাংলার প্রকৃতির অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যেমন, মাঘ মাসিয়া শীত, বনবিনাল, কলারপাতা, পানির সোতা, বাইদ্যা প্রভৃতি। ইহাতে সাধারণ মানুষ আরব মরুভূমি ও আরব প্রকৃতিকে বাংলাদেশের সহিত সহজেই তুলনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। তবে বাস্তবের সাথে তাহার কোন মিল নাই। যাহা হউক শেষ নবীর পবিত্র ও অমূল্য জীবনের প্রতিদিনের দুঃখ বেদনার, আনন্দ ও সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহকে শ্রদ্ধায় ও মানবতার তুলিতে আঁকিবার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। মহানবী (সাঃ) মানুষের মত আপন এবং প্রিয় তাহারই পরিচয়—'খাতামুন নবীঈন'।

তাওয়ারিখে মোহাম্মদী—মাদারীপুর জুনিয়ার মাদরাসার ভূতপূর্ব হেড মৌলভী মোহাম্মদ ছায়ীদ (১২৮৯—১৩৬২ বাং) হযরতের জীবনী সম্বলিত এই বিশাল পুথিটি রচনা করেন। পুথিটির ১—৫ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় এবং ৬ষ্ট—১০ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। পুথিটি দুইটি গ্রন্থে প্রকাশিত এবং প্রথম গ্রন্থের ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬৪ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশ লাভ করে। পুথি কাব্যের সুদীর্ঘ ভূমিকায় মুনাজাত, আল্লাহতা'আলার হাম্‌দ, রসূলের নাত, কেতাব রচনার কারণ, আরজ নামা ও রচকের পরিচয় রহিয়াছে। তিনি চাঁদপুর জেলার সদর থানার অধীন ইবরাহীমপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসায় চাকুরী করিতেন এবং মাদারীপুর মাদরাসায় যোগদানের পর হইতেই সম্ভবতঃ এই পুস্তক রচনা শুরু করেন। সুদীর্ঘ ১২ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ইহা রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে।

প্রথম খন্ড ১১২ পৃষ্ঠায়, দ্বিতীয় খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় অংশ ২২৪ পাতায়, চতুর্থ ভাগ ১০৯ পৃষ্ঠায়, পঞ্চম খন্ড সমাপ্ত হইয়াছে ১১৮ পাতায়। ষষ্ঠ খন্ডে রহিয়াছে ১২০ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা, সপ্তমে ১১৬ পাতায় রচনা, অষ্টমে ১২৫, নবমে ১২৮ এবং দশম খন্ডে বিবৃত হইয়াছে ১০৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী ঘটনাবলী। ১১৮৬ পৃষ্ঠার (ভূমিকা ছাড়া) এই বৃহৎ পুস্তকটি এমন ছন্দে-পয়ারে রচনা একজন শিক্ষকের পক্ষে খুবই কৃতিত্বের বিষয়। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে মরহুম আঃ কাঃ মুঃ আদম উদ্দীন বলেন—"গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক তথ্য সর্বত্র নির্ভরযোগ্য ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। ইহাতে হজরতের জীবনের বিভিন্ন সময়ে কুরআনের যে সকল অংশ নাযিল হইয়াছে সেই অংশগুলি সেই সময় দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানি সলীস বাঙ্গালায় হইলেও অন্যান্য পুঁথির ন্যায় পৃষ্ঠাগুলি ডান হইতে বামে বিন্যস্ত নহে, বরং অন্যান্য বাংলা গ্রন্থের ন্যায় বাম হইতে ডানে বিন্যস্ত। ভাষা বেশ মার্জিত। স্থানে স্থানে যে সকল সংস্কৃতজ বাংলা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও বেশ মার্জিত। আরবী ফারসী শব্দগুলির বানান শুদ্ধ নহে।"—(পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস)

'তাওয়ারিখে মোহাম্মদী' গ্রন্থ রচনা করিবার সময় কবি আরবী উর্দু ফারসীতে রচিত হযরতের অসংখ্য জীবনী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং কোরআন হাদিসের সাহায্যও যথেষ্ট লইয়াছেন। মাঝে বন্ধনীতে আয়াত অবতীর্ণের কারণ (শানে নজুল) বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের খন্ড-ভাষা ও বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :—

(ক) প্রথম খন্ড—মোহাম্মদী নূরের সৃজন হইতে কাবা গৃহের পুনঃ-নির্মাণ তথা হজরতের কয়েকটি মহৎ কার্যের বয়ান।

(খ) দ্বিতীয় খন্ড -হজরতের তৃতীয়বার ছিনাচাক ও অহির বিবরণ হইতে তায়েফের ঘটনা এবং মোশরেক কোরেশীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত আয়াত নাজিল হইয়াছে তাহার বয়ান।

(গ) তৃতীয় খন্ড—আছহাবে কাহাফ তথা মিরাজ ও চতুর্থবার ছিনাচাক হইতে কাবা শরীফ কেবলা নির্ধারণ হইবার ও ফাতিমা (রাঃ)-এর বিবাহের বয়ান।

(ঘ) চতুর্থ খন্ড—বদরের যুদ্ধ সহ হিজরী প্রথম বৎসরের ঘটনাবলী।

(ঙ) পঞ্চম খন্ড—উহুদের যুদ্ধ হইতে চতুর্থ হিজরী সালের ঘটনা-সমূহ—পর্দা প্রথা ফরজ হইবার বয়ান পর্যন্ত।

(চ) ষষ্ঠ খন্ড—জঙ্গে আহজাব বা খন্দকের বয়ান হইতে ওমরা কাজার বয়ান পর্যন্ত।

(ছ) সপ্তম খন্ড—চিঠি-পত্রের দ্বারা হেদায়েত করিবার বয়ান হইতে ইলা ও জিনাকারের শাস্তির বয়ান।

(জ) অষ্টম খন্ড—আকবরী হজের বয়ান হইতে হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত এবং হজরত রসুল আলায়হেচ্ছালামের গোছল, জানাজা ও কাফন-দাফন ইত্যাদির বয়ান।

(ঝ) নবম খন্ড—রওজা শরীফের জেয়ারত ও হজরত রসুল আলায়-হেচ্ছালামের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির বয়ান হইতে বিবিধ মোনাজাতের বয়ান পর্যন্ত।

(ঞ) দশম খন্ড—হজরত রসুল আলায়হেচ্ছালামের মোবারক স্বপ্নবাণী এবং গায়েব দর্শন ও শ্রবণের বয়ান হইতে শাফায়াতের বয়ান তথা হজরত রসুলের চরণে বিনীত নিবেদন, খোদার শুকর ও মোনাজাত।

হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) নবুওত প্রাপ্তির পর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কার কাফেরদের নিকট অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করেন। আমাদের কবির লেখনীতে এই দুর্ভোগের কাহিনীর বাণীরূপ লাভ করিয়াছে এইরূপে :—

"রেওয়ায়েত আছে ছহি বোখারী ভিতর।
চাচা আবু তালেবের ওফাতের পর।।
বহু কষ্ট নবীজীকে দিয়াছে কোফরান।
নাহি আছে সাধ্য তাহা করিতে বয়ান।।
যদি সত্য মোহাম্মদ না হতেন নবী।
এত কষ্ট সহিতে না পারিতেন কভি।।

চাদর কাপড় আদি গলে পেঁচাইয়া।
টানিতে টানিতে দিত ফাঁসি লাগাইয়া।।
ধুলা বালি আবর্জনা নাজিছ গোবর।
আনিয়া ঢালিয়া দিত মাথার উপর।
নাপাক প্রসব করা ছাগলের নাড়ি।
জবে করা উট বক্রী দুম্বার অঁতুড়ী।।
খানা খাইবার কালে এনে দিত পাতে।
কাপড় নাপাক করি দিত মলমুতে।।
যাতায়াত পথে কাঁটা বিছায়ে রাখিত।
হাটিবার কালে তাহা পায়েতে বসিত।।
ঢিলা মারি রক্তপাত করিত শরীরে।
ছেজদার সময় ছুরি রেখে দিত ঘাড়ে।।"
—(দ্বিতীয় খণ্ড)।

পুস্তকের দশম খণ্ডে 'নমুনাস্বরূপ কতক হাদিস শরীফের বয়ান' দেওয়া হইয়াছে। ছহি হাদিস হইতে সংগৃহীত এবং পয়ার ছন্দে রচিত এই অমৃত বাণীসমূহ মুসলমানদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে খুবই উপকারী হইবে। একটি হাদিস এইরূপ :—

"মোছলেম শরীফেতে লেখে এই মতে।
রেওয়ায়েত আছে আবু ছায়ীদ হইতে।।
কহিলেন রসুলুল্লা সোনায় সোনায়।
রূপায় রূপায় আর খুর্মায় খুর্মায়।।
গন্দমে গন্দমে কিংবা যবেতে যবেতে।
নমকে নমকে যদি চাহ বদলাইতে।।
দোন জিনিস চাই ওজন সমান।
নগদ নগদ চাই আদান প্রদান।।
বেশী দিলে বেশী নিলে হইবেক সুদ।
দোহাকে সমান শাস্তি দিবেন মাবুদ।।"

আমাদের আলোচনাধীন শেষোক্ত তিনটি পুস্তকেই হজরত রসুল (সাঃ)-এর প্রকৃত জীবন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলি বাংলাদেশের সর্বত্র সমাদৃত হইলেই মুসলমানগণ তাহাদের প্রিয়তম রসুল, আল্লার-সর্বশেষ নবী (সাঃ)-এর সত্যিকারের জীবন-কথা জানিয়া সুখী ও উপকৃত হইতে পারিবে।

সর্বশেষ নবী (সাঃ)-র মহান জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

৫৭০ ঈসায়ী সাল : ২৩শে এপ্রিল (মতান্তরে ৫৭১), ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার প্রত্যুষে মহানবীর জন্ম। ৭ দিন মায়ের দুগ্ধ পানের পর আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবাহ ৭ দিন দুগ্ধ পান করান। ১৫ দিন পর তায়েফের আবু জুয়ায়েব সায়াদীর কন্যা বিবি হালিমার গৃহে গমন। তথায় অবস্থানকালে ৫ম বছরে সিনা চাক।

৫৭৫ ঈঃ—মায়ের কোলে প্রত্যাবর্তন। ৬ বৎসর বয়সে মাতার সহিত মদীনায় পিতার কবর জিয়ারতে গমন এবং ফিরিবার পথে মাতৃ বিয়োগ।

৫৭৯ ঈঃ—পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল। পিতৃব্য খাজা আবু তালিবের রক্ষণাবেক্ষণে।

৫৮২ ঈঃ—বারো বৎসর বয়সে পিতৃব্যের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন। বসরা নগরের বুহায়রা নামক খৃস্টান পাদ্রী কর্তৃক মহানবীর নবুওয়াতের সাক্ষ্যদান।

৫৮৩ ঈঃ—বিবি খাদীজার ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিবি খাদীজার দাস মায়-ছারাসহ সিরিয়া গমন এবং প্রচুর লাভ অর্জন। নাহতুরা খৃস্টান সাধু কর্তৃক নবুওয়াতের সাক্ষ্যদান।

৫৮৫ ঈঃ—ওকাজ মেলায় কেনানা, কুরাইশ এবং বনী হাওয়াজেন গোত্রের অন্যায় সমরের বিরুদ্ধে পিতৃব্যের সহিত যোগদান।

৫৯৫ ঈঃ—'হিলফুল ফুজুল' বা কল্যাণী সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠা। ২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে ৪০ বৎসর বয়স্ক বিধবা বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে পত্নীরূপে গ্রহণ। এই সময়ের আগেই পূত চরিত্র, সত্যকথন ও বিশ্বস্ততার জন্য 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত।

৬০৫ ঈঃ—কুরাইশদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন এবং কাবা গৃহের পুনঃনির্মাণে অংশগ্রহণ; হেরা গুহায় আধ্যাত্মিক ধ্যানমগ্ন। নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত ধ্যানমগ্নতা থাকে।

৬১০-১১ ঈঃ—পবিত্র রমজান মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে ৪০ বৎসর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং গোপনে ইসলাম প্রচার আরম্ভ।

৬১৩ ঈঃ—প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ লাভ। সাফা পর্বতে উঠিয়া কুরাইশদের সকল গোত্রকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। কুরাইশদের বিরোধিতার সম্মুখীন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-সহ বেশ কিছু লোকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।

৬১৫ ঈঃ—রজব মাসে হযরত ওসমান (রাঃ) তদীয় স্ত্রী বিনতে রাসুলুল্লাহসহ ১৪ জন নবদীক্ষিত মুসলমানের আবিসিনিয়ায় হিজরত।

৬১৬ ঈঃ—শেষ নবীর দাওয়াত কবুল করিয়া হযরত হামজা (রাঃ) ও হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬১৭ ঈঃ—আবু লাহাব ব্যতীত হাশেমী গোত্রের সকল লোক ও মুসলমানগণ সহ 'শা'বে আবু তালেব' নামক গিরি উপত্যকায় তিন বৎসরের জন্য অবরুদ্ধ। কাফেররা তখন মুসলমানদিগকে পুরাপুরি বয়কট করে।

৬২০ ঈঃ—বিবি খাদীজার ৬৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল। পাঁচ সপ্তাহ পরে দুর্দিনের আশ্রয়দাতা স্নেহময় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু। দুঃখের বৎসর ঘোষণা। কুরাইশদের তরফ হইতে নিরাশ হইয়া ইসলাম প্রচারের জন্য পালকপুত্র জায়েদকে লইয়া তায়েফ গমন। ১০ দিন পর অপমানিত, নির্যাতিত ও প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হইয়া প্রত্যাবর্তন। রজব মাসের ২৭ তারিখে গভীর নিশীথে বোরাক ও রাফ রাফ যোগে ফিরিশতা শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাইল (আঃ) সহ স্বশরীরে ঊর্ধাকাশে মি'রাজ গমন; স্বচক্ষে বেহেশত দোজখসহ সৃষ্টিশেষের শেষ পরিণতি অবলোকন।

৬২১ ঈঃ—হজ্ব মৌসুমে মদীনার ১০ জন খাজরাজ ও দু'জন আউস গোত্রের লোকের ইসলাম কবুল এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ।

৬২২ ঈঃ—মদীনা হইতে ৭৩ জন (মতান্তরে ৭৫ জন) নর-নারী হজ্বের সময় মীনাতে মহানবীর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন; তাহারা রাসুল (সাঃ)-কে মদীনায় গমনের দাওয়াত দেন এবং সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। শেষ নবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করিয়া ৮ই রবিউল আউয়াল কোবা পল্লীতে পৌঁছেন;

১২ই রবিউল আউয়াল মদীনা শহরে পৌঁছেন। এই সময় মহানবীর বয়স ৫৩ বৎসর ছিল। মসজিদে নববী নির্মাণ। আযান প্রবর্তিত হয়।

৬২৩ ঈঃ—১২ই সফর জিহাদের নির্দেশ জারী হয়; এই নির্দেশ কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। মদীনার পুনর্গঠন ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন হিসাবে মদীনার সনদ স্বাক্ষরিত। রজব বা শাবান মাসে কেবলা পরিবর্তিত হয়। রোজার হুকুম নাজিল হয়।

৬২৪ ঈঃ—১৭ই রমজান বদর যুদ্ধের মাধ্যমে গাজওয়াসমূহের সূচনা হয়। এই যুদ্ধে ৭০ জন কাফির নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩১৩ আর কাফিরদের ছিল এক হাজার। বনি কায়নুকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৬২৫ ঈঃ—শাওয়াল মাসে উহুদের যুদ্ধ—বদরের পরাজয়ের গ্লানি দূর করিতে কুরাইশগণ মদীনার উপকণ্ঠে উহুদের পাদদেশে সমবেত হয়। ৭০০ বর্শাধারী, ২০০ অশ্বারোহীসহ কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ হাজার। আর দুইজন অশ্বারোহী ১০০ বর্শাধারী ও ৫০ জন তীরন্দাজসহ মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০০। প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের জয় লাভের পর মহানবীর আদেশ অমান্যের কারণে ৭০ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। মহানবী (সাঃ) মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার দাঁত মোবারক শহীদ হয়।

৬২৬ ঈঃ—বীরে মাউনা নামক স্থানে ৬৯ জন মুসলমান ধর্মপ্রচারকের শাহাদত বরণ। গাজওয়ায়ে বনি নাযীর। মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়।

৬২৭ ঈঃ—গাজওয়ায়ে বনি মুস্তালিক ও খন্দকের যুদ্ধ—ইহা পরিখা বা আহজাবের যুদ্ধ নামেও খ্যাত। ওয়াদা ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মদীনার ইহুদীদের ২৫০ জনের প্রাণদন্ড দেওয়া হয়। পর্দার নির্দেশ জারী হয়।

৬২৮ ঈঃ—শেষ নবী (সাঃ) স্বপ্নে হজ্জব্রত পালন করিতে দেখিয়া ১৪০০ সাহাবীসহ মক্কার সন্নিকটে হুদাইবিয়া (বর্তমান নাম সুমাইসিয়া)

নামক স্থানে তাশরীফ নিলে কাফিররা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে হুদাইবিয়ার সন্ধি জিলকদ মাসে সম্পাদিত হয়। নবী (সাঃ) বিদেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়া দূত ও পত্র প্রেরণ করেন।

৬২৯ ঈঃ—শেষ নবী (সাঃ) প্রায় দুই হাজার সাহাবীসহ ২রা মার্চ মুলতবী ওমরা পালন করেন। সিরিয়া সীমান্তে জমাদিউল উলা মাসে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৬৩০ ঈঃ—২০ই রমজানে মক্কা বিজয়। নবী (সাঃ)-এর ১২০০০ সৈন্যসহ হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ। নবীপুত্র হযরত ইব্রাহীমের জন্ম।

৬৩১ ঈঃ—রজব মাসে তাবুকে মহানবী (সাঃ) ২০ দিন অবস্থান করিয়া বিনা-যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করেন। নানাস্থানে বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। কাফিরদের সাথে গোত্রীয় সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা।

৬৩২ ঈঃ—সর্বশেষ নবী (সাঃ)-এর প্রথম ও শেষ হজ্জ পালন; বিদায় হজ্জের খুতবা প্রদান। এই সময় তিনি ৭ই মার্চ বা ৫ই জিলহজ্জ তারিখে মক্কা শরীফে অবস্থিত হন। ইসলামের পূর্ণতা বিধান ও ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবনবিধান হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক স্থায়ীভাবে মনোনয়ন। একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল বা ৮ই জুন সোমবার অপরাহ্নে শেষ নবী (সাঃ) এর পবিত্র আত্মা 'রফিকে আ'লা' এর নিকট যাত্রা করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হুজরাতে তিনি মদফুন হন।

"হাতিকা রওযা তাফুহু নাসীমা
সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লেমু তাসলীমা।"
—"মৃদু সমীরণ ছড়ায় এমন রওজা-বাগানে এসো হে,
মুমিন সকলে দরূদ ভেজিতে সালাত-সালাম পড়ো হে।"

আকাশ তলে আরশের অধিক আদবপূর্ণ ভূমি,
কোথায় এমন জমিন যেথা বায়গো হৃদয় খোলা।
ধন্য মানে সকল মুমিন—পুণ্য ভূমি চুমি,
জুনায়েদ আর বায়জিদও হায়—হয় যে আত্মভোলা।

— ঃ সমাপ্ত ঃ—

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ/সংকলন।

প্রকাশিতঃ

১। মুসলিম ও মুসলিম বিশ্ব (১৯৭০ঈ)
২। কাদিয়ানী ধর্মমতঃ একটি পর্যালোচনা (১৯৮৫ঈ)
৩। একটি পুণ্যময় জীবনঃ হযরত মুফতি সাইয়েদ মোহাম্মদ আমিমুল এহসান (রাহ) (১৯৮৮ঈ)
৪। কাদিয়ানী ধর্মমতঃ স্বরূপ ও পর্যালোচনা–(১৯৮৯ঈ)
৫। বাহাইঃ একটি ভ্রান্তধর্ম (১৯৯০ঈ)
৬। পরধর্ম গ্রন্থে শেষনবী (সাঃ)– (১৯৯১ঈ)

প্রকাশিতব্যঃ

৪ হাদীসে রাসূল (সাঃ) ও কাদিয়ানী আক্বিদা
৪ ইতিহাসের ফিলিস্তিনঃ আরব ও ইহুদী
৪ বাংলা কাব্যে সর্বশেষ নবী (সাঃ)
৪ চার সাহাবী কবিঃ জীবন ও কাব্য
৪ পবিত্র কোরআন ও আমরা
৪ বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা

তাওহীদ প্রকাশনী, ঢাকা ১২১৬